বঙ্গ

কমলবার্তা

সেপ্টেম্বর সংখ্যা। ২০২৪

উৎসব নয়। 'অভয়া অষ্টমী'-তে আমাদের শক্তিরূপিণী মায়ের আরাধনা

ভারতের জেলেনেস্কি হতে চান রাহুল?

তৃতীয় মোদী সরকারের ১০০ দিন

ইউনূসের বাংলাদেশে ঘৃণ্য হিন্দু নিধন

প্যারা-অলিম্পিকে সোনার হাসি মোদীর নতুন ভারতে

এগিয়ে বাংলা নারী নির্যাতনে

আরজি করের ভয়াবহ আবহে অভয়া

এক দেশ নির্বাচন

বাংলায় দুর্গাপূজার ইতিহাস

কোয়াড (চতুর্দেশীয় অক্ষ) বৈঠকের প্রাক্কালে আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়-এর বাড়িতে গনেশ পূজায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সিঙ্গাপুর সফরে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওয়াং-এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সফরে সেমিকন্ডাক্টর, ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক ৪টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

দারুসসালাম সফরে ব্রুনেই-এর প্রধানমন্ত্রী সুলতান হাজি হাসানাল বলকিয়াহ-এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নয়াদিল্লিতে জাতীয় সদস্যতা অভিযানের শুভ সূচনায় শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

মহারাষ্ট্রের জালগাও-এ মা ও বোনদের আশীর্বাদে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী।

বঙ্গ
কমলবার্তা
সেপ্টেম্বর সংখ্যা। ২০২৪

তৃণমূল জমানায় নারী নির্যাতনে এগিয়ে বাংলা *অমিতাভ চক্রবর্তী*	৪
আরজি করের ভয়াবহ আবহে অভয়া *ডাঃ কল্যাণ আশিস মুখার্জি*	৯
এক দেশ এক নির্বাচন *সাহানা মুখোপাধ্যায়*	১০
রাহুল গান্ধী কি ভারতের জেলেনেস্কি হতে চান? *সৌভিক দত্ত*	১৪
ছবিতে খবর	১৬
বাংলায় দুর্গাপূজার ইতিহাস *বিনয়ভূষণ দাশ*	২২
১০০ দিন পূর্ণ করল তৃতীয় মোদী সরকার *শুভ্র চট্টোপাধ্যায়*	২৫
ইউনূসের হিংসার বাংলাদেশে ঘৃণ্য হিন্দু নিধন *দিব্যেন্দু দালাল*	২৮
প্যারা-অলিম্পিকে সোনার হাসি এনে দিল মোদীর নতুন ভারত *অভিরূপ ঘোষ*	৩০
ফেক নিউজ	৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

খাদ্য জেলে শিক্ষা জেলে স্বাস্থ্য জেলে পুলিশ জেলে-
তবু কত পথ হাঁটলে বল,
তোমার হুমকি
তোমার মিথ্যা
তোমার ভাষণ-
স্বজন – পোষণ আর মুড়িমুড়কির মত
মত ধর্ষণ আর হত্যার স্রোত
চিরস্তব্ধ হবে।

বন্যার জলের মত অনর্গল মিথ্যায় তুমি কি ভেবেছ নরকের কীট
আমরা ভুলে যাব, আমাদের ঘরের মেয়ে অভয়ার
প্রাণ বেরনোর আগে শেষ আর্তনাদ?
ভুলে যাব
ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই চিৎকারে
যখন তুমি বাঁচতে চাইছিলে আর
বাঁচাতে চাইছিলে এক অসুস্থ জানোয়ারকে?
ভুলে যাব
যখন তুমি নিজেই নিজের
ঘরের মেয়ের খুনের পরে-
অভিযোগ খণ্ডাতে
দাড় করিয়েছিলে
কোটি টাকার একুশ উকিল?

মিথ্যুক তুমি
অত্যাচারী,
ভণ্ড তুমি।
মিথ্যা তোমার লোকদেখানো
মায়ের পূজা।
ভুলব আমি যখন তুমি
আরজি করে খুনের রক্ত
শুকিয়ে কাঠ হবার আগেই
উৎসবের ডাক
দিয়েছিলে?

ধিক তোমাকে লজ্জাহীনা।
অভয়ার নামে শপথ নিয়ে
বলছি তোমায় শুনে রাখ -
ফিরব আমরা ভীষণভাবে
প্রতিবাদের সেই উৎসবে।

তৃণমূল জমানায় নারী নির্যাতনে এগিয়ে বাংলা

অমিতাভ চক্রবর্তী

আরজি কর কাণ্ডে উত্তাল রাজ্য। উত্তাল দেশ। কিন্তু এর আগেও ঘটেছে একাধিক নৃশংস খুন ও ধর্ষণের ঘটনা। খোদ কলকাতা শহরেও ঘটেছে। উত্তাল হয়েছে রাজ্য। ধামাচাপা দিয়েছে সরকার। কিন্তু এবারে প্রধান বিরোধী দল বিজেপির পাশাপাশি সাধারণ মানুষও বিচারের দাবীতে নেমেছে রাস্তায়। স্বাভাবিক। ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রতিটি জেলায়, শহরে, গ্রামে নারী নির্যাতনে ভয়ঙ্কর রেকর্ড তৈরি করেছে 'এগিয়ে বাংলা'-র তৃণমূল।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরের বছরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার বাংলাকে নারী নির্যাতনে দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে নিয়ে যায়। তথ্য বলছে, ২০১১ সালে এ রাজ্যে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ২৯,১৩৩ টি মামলা দায়ের হয়েছিল। ২০১২ সালে সেটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩০,৯৪২। পর পর দু'বার নারী নির্যাতনে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় ক্ষুব্ধ হয়ে এনসিআরবি-কে তথ্য পাঠাতেই নিষেধ করেছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর আমলে নারী নির্যাতনের বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে বাংলা। এতে কোনও সন্দেহ নেই। তৃণমূল জমানায় বীভৎস নারী নির্যাতনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি একনজরে দেখা যাক।

== দার্জিলিং ==

২০১৬ সালের ডিসেম্বরে কার্শিয়াং-এ অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। কার্শিয়াং-এর রিম্বিক থেকে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শৈলসহর দার্জিলিং-এ একটি বন্ধ প্রাইভেট হোটেলের বাথরুমে নাবালিকার অর্ধনগ্ন শরীর পড়ে থাকতে দেখা যায়। নৃশংসভাবে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দার্জিলিং-এর খড়িবাড়ি থানা এলাকায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে ৬৮ বছরের এক বৃদ্ধ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে এই ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই দার্জিলিং জেলার মিরিকে এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করা হয়। এই ঘটনার খবর সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকায় এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

== জলপাইগুড়ি ==

২০১৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় জলপাইগুড়িতে এক তরুণীকে দুদিন আটকে রেখে গণধর্ষণ করা হয়। জলপাইগুড়ির গোশালা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

২০২২ সালে জলপাইগুড়িতে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়। বাড়িতে গিয়ে নির্যাতিতাকে খুনের হুমকিও দেয় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় মমতা পুলিশ অভিযুক্তদের আগাম জামিন দিয়ে দেয়। তারপরই ওই নাবালিকা গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করে।

২০২২ সালের একেবারে শেষ ডিসেম্বরে জলপাইগুড়িতে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে বাড়িতে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

২০২৪ সালের মার্চ মাসেই জলপাইগুড়িতে মমতা পুলিশের এসআই রাজনারায়ণ রায় এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করে।

== আলিপুরদুয়ার ==

২০১৩ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি আলিপুরদুয়ারের একটি চা বাগানে এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করে ওই বাগানেরই শ্রমিক অ্যালবার্ট টেপ্পো।

২০২০ সালে আলিপুরদুয়ারে এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে বারবার গণধর্ষণ করা হয়।

২০২১ সালের ১৫ জুন আলিপুরদুয়ারে ৩৫ বছর বয়সী এক মহিলাকে নগ্ন করে গোটা গ্রামে ঘোরানো হয়। রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী চুপ থাকেন এই ঘটনার পরেও। **২০২৩** সালে আলিপুরদুয়ারে এক নাবালিকাকে ফাঁকা মাঠে একা পেয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। অত্যাচারের সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে সপ্তম শ্রেণীর ওই ছাত্রী। ঘটনা শামুকতলা এলাকার।

২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে আলিপুরদুয়ারে চলন্ত ট্রেনে এক মহিলা যাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়।

== কোচবিহার ==

২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর কোচবিহার ১ ব্লকের, বছর ৩৫-এর এক মহিলাকে তাঁর সন্তানদের সামনেই গণধর্ষণ করা হয়।

২০২৩ সালের জুলাই মাসে কালজানিতে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা ঘটে।

২০২৪ সালের জুন মাসে লোকসভা ভোট পরবর্তী হিংসায় কোচবিহারে এক মহিলা বিজেপি কর্মীকে গণ ধর্ষণ করা হয়।

== উত্তর দিনাজপুর ==

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে এক নাবালিকাকে ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়।

২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। তারপর তার মৃতদেহ পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়।

== দক্ষিণ দিনাজপুর ==

২০১৮ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডি এলাকায় এক আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয়। ওই মহিলার গোপনাঙ্গ থেকে ধাতব বস্তু উদ্ধার হয়। **২০১৯** সালে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে পুনর্ভবা নদীর ধার থেকে উদ্ধার হয় এক যুবতীর গলা কাটা দেহ। তাঁকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়।

২০২০ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জের ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়।

২০২২ সালের ২৪ জুলাই দক্ষিণ দিনাজপুরে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভিড় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি স্কুলে চড়াও হয় এবং মহিলা শিক্ষিকাকে প্রায় নগ্ন করে। ওই শিক্ষিকার অপরাধ, তিনি নাকি ইসকুলে শৃঙ্খলা শিখিয়েছিলেন ছাত্রীদের।

২০২২ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে এক অসুস্থ বিধবা মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়।

২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টা করা হয়।

== মালদা ==

২০১৬ সালের ২৫ জুলাই মালদায় এক বয়স্কা মহিলাকে বিবস্ত্র করে বাঁ হাতের দুটো আঙুল কেটে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় শোরগোল পড়লেও চুপ ছিলেন রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী।

২০১৯ সালে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকে তিন বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়।

২০২২ সালের ১৫ মে মালদায়, বাড়িতে একা পেয়ে তিন যুবক এক মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। ওই মহিলা বাধা দিলে

তাঁকে বিবস্ত্র করা হয় এবং নানা ভাবে মানসিক নির্যাতনও চলে সঙ্গে। এই ঘটনার পরেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীরব থাকেন।

২০২৩ সালের ২১ জুলাই মালদার মানিকচকে প্রকাশ্যে নগ্ন করে দুই মহিলাকে মারধরের মধ্যযুগীয় বর্বরতা সামনে আসে। সব থেকে আশ্চর্যজনক তথ্য হল, মমতার পুলিশের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই পুরাতন মালদার একটি বন্ধ ইটভাটা থেকে ১৩ বছরের এক ফুটফুটে, নিষ্পাপ নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। তাকেও গণধর্ষণ করে খুন করা হয়।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের ভুট্টার ক্ষেতে বছর ত্রিশের এক বধূকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে ১৪ বছরের অষ্টম শ্রেণীর এক পড়ুয়াকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে পুকুরের জলে ডুবিয়ে খুন করা হয়। ঘটনা মালদার হাবিবপুর থানা এলাকায়।

== মুর্শিদাবাদ ==

২০১৩ সালে অক্টোবর মাসে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কাতে ১৩ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

২০১৩ সালের অক্টোবর মাসেই মুর্শিদাবাদের সুতি থানার ভালিয়াপুর গ্রামে ১৪ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

২০১৫ সালের ৬ নভেম্বর মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার পুন্ডি গ্রামের ধুলাগড়ের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় এক নাবালিকার মৃতদেহ। এক্ষেত্রেও ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

২০২২ সালের ২৬ অক্টোবর মুর্শিদাবাদে মধ্যযুগীয় বর্বরতার আরও চিত্র দেখা যায় মুর্শিদাবাদে। দুইজন সমকামী মহিলাকে নগ্ন করে ঘোরানো হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে।

২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় ধর্ষণ করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করা হয়। তার চোখ দুটিকে উপড়ে নেওয়া হয়।

২০২৪ সালের ১১ অগাস্ট মুর্শিদাবাদের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়।

== উত্তর ২৪ পরগণা ==

২০১৩ সালে কামদুনিতে এক কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ করার পরে খুন করে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় তোলপাড় হয় রাজ্য।

২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে বসিরহাটে এক যুবতীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয় তারপর দেহ ফেলে দেওয়া হয় নয়ানজুলিতে।

২০২৪ সালের মে মাসে বারাসাতে নার্সিংহোমের ছাদ থেকে এক নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

== দক্ষিণ ২৪ পরগণা ==

২০১৭ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুরের লেনিননগরে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়।

২০২৩ সালে ডায়মন্ডহারবারে এক মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয়।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে টিউশন থেকে ফেরার পথে ধর্ষণের শিকার হতে হয় দুই নাবালিকাকে। একজন অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া অপরজন দশম শ্রেণীর পড়ুয়া। **২০২৪** সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে উত্তাল হয় সন্দেশখালি। সেখানকার স্থানীয় মহিলাদের তৃণমূল নেতারা পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চালাত। এই ঘটনায় তোলপাড় হয় দেশ। রাস্তায় নামেন মহিলারা।

২০২৪ সালের জুন মাসে এক তরুণীকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরে।

== ঝাড়গ্রাম ==

২০১৫ সালের মে মাসে ঝাড়গ্রামের বেলিয়াবেড়া থানা এলাকায় এক মহিলাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করা হয়।

২০২১ সালে ৪ নভেম্বর ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানা এলাকায় পাঁচ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

== পূর্ব মেদিনীপুর ==

২০১৪ সালে কাঁথির সুনিয়া গ্রামে এক মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

২০১৬ সালে দীঘার সমুদ্রতটে এক তরুণীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক মহিলাকে দীঘার কাছে নির্জন জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়।

২০১৮ সালে পূর্ব মেদিনীপুরে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

== পশ্চিম মেদিনীপুর ==

২০১৯ সালের গোড়ায় পশ্চিম মেদিনীপুরে ৬ ঘন্টার ব্যবধানে এক আদিবাসী যুবতীকে তিনবার গণধর্ষণ করা হয়।

২০২১ সালের ৩ মে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় দ্বিতীয় বর্ষের কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

== হাওড়া ==

২০২০ সালে হাওড়ার জয়পুরে একটি হোমে ৪ প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়।

২০২৩ সালের ৮ জুলাই হাওড়ায় পঞ্চায়েত ভোটের দিন বিজেপির এক মহিলা প্রার্থীকে নগ্ন করে অত্যাচার চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

২০২৪ সালের জুন মাসে হাওড়াতে গলায় ছুরি ধরে ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করা হয়।

== হুগলি ==

২০১৯ সালে হুগলির ধনিয়াখালিতে এক নাবালিকাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করা হয়।

২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে বলাগড়ে এক বিশেষভাবে সক্ষম যুবতীকে ধর্ষণ করে এক তৃণমূল কর্মী।

== পুরুলিয়া ==

২০১৩ সালে ৩০ মে বাগমুণ্ডি থানা এলাকার বীরগ্রামে এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করে তার যৌনাঙ্গে ব্লেড চালিয়ে দেওয়া হয়।

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এক কিশোরীকে ধর্ষণের পর তার ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

২০২০ সালের জুলাই মাসে ৭০ বছরের এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। এই নৃশংস ঘটনা ঘটে পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ানে।

২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে এক মহিলা ও তাঁর নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণ করা হয় পুরুলিয়াতে।

== নদিয়া ==

২০১৫ সালে মার্চ মাসে নদীয়াতে এক খ্রিস্টান নান-কে ধর্ষণ করা হয়।

২০২২ সালের এপ্রিল মাসে হাঁসখালিতে ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয়। এরপরে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই নাবালিকার মৃত্যু হয়। অভিযুক্তরা

প্রত্যেকেই তৃণমূল কর্মী বলে এলাকায় পরিচিত। এরপরে ওই নাবালিকার বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তারা হুমকিও দেয়।

২০২২ সালে ফের একবার অক্টোবর মাসে নদিয়ার হাঁসখালিতে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়।

== বীরভূম ==

২০১২ সালে রামপুরহাট রেল স্টেশনের কাছে এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয়।

স্টেশন রুম থেকে দুষ্কৃতীরা তাকে টেনে হিঁচড়ে পাশের মাঠে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে।

২০১৪ সালে ২১ জানুয়ারি বীরভূম জেলায় এক কুড়ি বছর বয়সি আদিবাসী রমণীকে সালিশি সভায় ১৩ জন মিলে গণধর্ষণ করে।

২০১৭ সালে বীরভূম জেলার পাড়ুই থানায় এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করা হয়।

২০১৮ সালে বীরভূম জেলার মহম্মদবাজারের জঙ্গলে এক আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়।

২০১৯ সালের ১৯ অক্টোবর বীরভূমে এক মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধর করা হয়। যারা ওই মহিলাকে উদ্ধার করতে যায়, তাদের ওপরেও চড়াও হয় সমাজবিরোধীরা। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে নারীর সম্মান।

২০২০ সালে টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে বীরভূম জেলার মুরারই-তে ধর্ষণ করা হয়। পরে বাড়িতে এসে কীটনাশক খেয়ে ওই নির্যাতিতা আত্মঘাতী হয়।

২০২৩ সালের মার্চ মাসে শান্তিনিকেতনে এক আদিবাসী তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয়। ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে ছেলেকে খুনের হুমকি দিয়ে তার মাকে ধর্ষণ করা হয়। যোনিতে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে অত্যাচার চালায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা। ঘটনা বীরভূমের বোলপুর থানার করিমপুর গ্রামে।

== পশ্চিম বর্ধমান ==

২০১২ সালে আসানসোলের এক পলিটেকনিক কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়।

২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে অষ্টম শ্রেণীর এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়।

২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের বারাবনি থানা এলাকায় এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয়।

== পূর্ব বর্ধমান ==

২০১২ সালে চলন্ত ট্রেনে কাটোয়াতে এক মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয়।

২০১৩ সালের ২৯ মার্চ মঙ্গলকোটে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়।

২০১৮ সালে বর্ধমান শহরেই ধর্ষণ করা হয় ৭০ বছরের এক বৃদ্ধাকে।

২০১৯ সালে পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে এক মহিলাকে ধর্ষণ করে তাঁর দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

২০২৪ সালের জুন মাসে নাতনির সামনেই তার দিদিমাকে গণধর্ষণ করা হয় পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে।

==বাঁকুড়া==

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাঁকুড়া সদর থানায় দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে দুষ্কৃতীরা।

২০১৮ সালে বাঁকুড়াতে কেশোরা এলাকায় রেল লাইনের ধারে এক মহিলার নগ্ন দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার মুখ পুড়িয়ে দেওয়া হয় অ্যাসিড দিয়ে। এক্ষেত্রেও ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

২০২৪ সালের জুন মাসে বাঁকুড়াতে এক নাবালিকাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে তিন যুবক।

২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের জঙ্গল থেকে এক মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হয়। ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।

==কলকাতা==

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্কস্ট্রিট গণধর্ষণ কাণ্ডে তোলপাড় হয় রাজ্য।

২০১৭ সালের ১৮ মার্চ কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি এবং বিবস্ত্রের অভিযোগ ওঠে। এক রাজনৈতিক কর্মীকে চেক করার নামে এই কাজ করে পুলিশ। যদিও কোনও বিবৃতি শোনা যায়নি পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফ থেকে।

২০১৮ সালের ১৭ মে কলকাতার সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল কলেজে এক ছাত্রীকে জোর পূর্বক বিবস্ত্র করানো হয়। এবং পুরো ঘটনা ক্যামেরাবন্দী করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল করা হয়।

২০২৪ সালের অগাস্টে আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

এমন 'চোখধাঁধানো' এবং লজ্জাজনক রেকর্ডের পরও আরজি কর কাণ্ডে ল্যাজেগোবরে হয়ে 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে' প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ১টি নয়, ২টি চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর দাবী ছিল, খুন ও ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য কঠোর কেন্দ্রীয় আইন। বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত নিস্পত্তির দাবীও ছিল সেই চিঠিতে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পাল্টা চিঠিতে, নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্না দেবী মমতা ব্যানার্জিকে মনে করিয়ে দেন, "একমাত্র বাংলাতেই আটকে আছে 'ফাস্ট ট্র্যাক' বিশেষ আদালত তৈরির কাজ। রাজ্যে ৪৮,৬০০টি ধর্ষণ এবং পকসো মামলা মুলতুবি থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিশুদের ওপর ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের মামলাগুলির জন্য অতিরিক্ত ১১টি ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত চালু করেনি, যেগুলি একচেটিয়া পকসো আদালত হতে পারে বা ধর্ষণ ও পকসো (যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন) উভয় ক্ষেত্রেই রাজ্যের প্রয়োজন অনুসারে কাজ করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ৮৮টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু করেছে, তা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় পড়ে না। হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্যগুলি যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু করেছে, সেখানে বৃহত্তর ক্ষেত্রে, প্রবীণ নাগরিক, মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী, এইচআইভি - এইডস মামলা, অন্যান্য গুরুতর অসুখ সংক্রান্ত মামলা, জমি অধিগ্রহণ, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ, জঘন্য অপরাধ সংক্রান্ত মামলার শুনানি হওয়ার কথা। চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত সেই সংক্রান্ত মোট ৮১ হাজার ১৪১টি মামলা পড়ে রয়েছে। এই বিষয়ে আপনার চিঠিতে থাকা তথ্য বাস্তবিকভাবে ভুল এবং রাজ্যে ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালতগুলি চালু করতে যে বিলম্ব হয়েছে, তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা বলেই মনে হচ্ছে"। ফাস্টট্র্যাক কোর্টগুলিতে স্থায়ীভাবে যে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগের দাবি তুলেছেন মমতা তা নিয়ে অন্নপূর্ণা দেবীর চিঠিতে পরিষ্কার জানানো হয়েছে, "কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী, একজন জুডিশিয়াল অফিসার এবং সাতজন কর্মী শুধুমাত্র পকসো আইনে দায়ের হওয়া মামলাগুলি নিস্পত্তির দায়িত্বেই থাকবেন। তাই ফাস্টট্র্যাক কোর্টগুলির অতিরিক্ত দায়িত্ব কোনও জুডিশিয়াল অফিসার বা আদালত কর্মীকে দেওয়া যাবে না। ২০২৩ সালের ১২ ডিসেম্বর সেকথা আগেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী না থাকাতে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি চুক্তিভিত্তিক জুডিশিয়াল অফিসার এবং কর্মী নিয়োগ করতে পারে বলে জানানো হয়েছিল আগেই"।

ধর্ষণে সংক্রান্ত মামলায় যে কড়া আইন আনার দাবি জানিয়েছিলেন মমতা, সেই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী জানিয়েছেন, "ধর্ষণ এবং ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় কড়া শাস্তির বিধান রয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায়। কমপক্ষে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, অপরাধ কতটা গুরুতর, সেই অনুযায়ী যাবজ্জীবন এমনকি মৃত্যুদণ্ডের বিধানও রয়েছে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত এবং ফরেন্সিক পরীক্ষা, এফআইআর দায়েরের দুই মাসের মধ্যে এবং চার্জশিট দায়ের হওয়ার দুই মাসের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করার কথা বলা রয়েছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতায়। মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা এবং অপরাধ রোখার জন্য যথেষ্ট কড়া বিধান এনেছে কেন্দ্র, রাজ্য সেগুলি মেনে চললে সুফল মিলবে বলেও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী।

আরজি করের ভয়াবহ আবহে

অভয়া

ডাঃ কল্যাণ আশিস মুখার্জি

কে এই সন্দীপ ঘোষ? কেন তিনি শাসকদলের অপরিহার্য? কেন তাকে শাসকদল এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করেও রক্ষা করতে তৎপর? তাহলে কি কোন বৃহৎ এবং ঘৃণ্য দুর্নীতির কেন্দ্রে আছেন এই সন্দীপ ঘোষ, যিনি শাসকদলের তথা মন্ত্রীর বিপদের কারণ হতে পারেন?

সরকারী সব মেডিকেল হাসপাতালগুলিতে যেমন এমনিতেই খুব ভিড় হয়, তারপর কোন কোন দিন এই চাপটা খুব বেশি থাকে। সেরকম একটি দিন, সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত, রাত্রে ডিউটি আছে। একজন ক্রিটিক্যাল রোগীকে স্টেবেল করতে রাত প্রায় দুটো বেজে গেছে। খুব জোর খিদে পেয়েছে। হাসপাতালের গেটের ধারে একটি খাবারের জায়গা ছিল। সারারাত খোলা থাকত। চা ইত্যাদি পাওয়া যেত, আর মাঝরাতেরও আমাদের জন্য ম্যাগী বানিয়ে দিত। হাতে ম্যাগীর প্লেট নিয়ে বাইরের ফাঁকা রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছি, এমন সময় বাইরে হঠাৎ কিসের গোলমাল শোনা গেল। অতো রাতে আশেপাশের বেশ কিছু লোক এসে জড়ো হল। ঝামেলা দেখে তড়িঘড়ি দাম মিটিয়ে, ছুটে চলে এলাম ডিউটি রুমের দিকে। এখানে আমরা সেফ, নিশ্চিন্ত। যাক্ বাবা! একটু বিশ্রাম নিই। সেই আরজি কর মেডিকেল কলেজ, সেরকমই ডিউটি রুম— কিন্তু 'অভয়া' নিশ্চিন্ত নয়, আতঙ্কিত ভয়ার্ত।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনী হিসেবে অভয়ার ঘটনা আমাকে হয়ত মানসিকভাবে অধিক স্পর্শ করেছে, কিন্তু সামগ্রিক মানবসমাজ এই ভয়াবহ ঘটনায় যেভাবে সমব্যথী হয়েছে তা সত্যই বিস্ময়কর।

'অভয়ার' মৃত্যু এবং তাঁর উপর পৈশাচিক নির্যাতন যা আরজি কর হাসপাতালে হয়েছে তা এক কথায় ভয়ংঙ্কর এবং আতঙ্কজনক। ঘটনা পরম্পরার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন কারণ সংবাদমাধ্যমের দীর্ঘ বিবরণ ও আলোচনা আমরা নিত্যদিন দেখেছি, শুনেছি। যা তথ্য আমাদের সকলের সামনে আজকের দিনে রয়েছে তার বিশ্লেষণ যদি আমরা করি তবে বুঝতে পারব এই ঘটনাটি কেবলমাত্র একটি মৃত্যু বা ধর্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ঘটনার ভয়াবহতা অনেক ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। এই নৃশংস ঘটনা এবং তার পরবর্তীকালে ঘটে যাওয়া ঘটনা পরম্পরকে আমরা দুইটি পৃথক ভাগে ভাগ করেত পারি।

১) কর্মক্ষেত্রে সরকারীভাবে পুলিশ দ্বারা সুরক্ষিত একটি কলেজে এক মহিলা কর্মচারীর কর্তব্যরত অবস্থার খুন ও ধর্ষণ এবং নিঃশব্দে আততায়ীর নিষ্ক্রমণ।

২) সরকারীভাবে তথ্য প্রমাণ লোপাটের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা, যার মধ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্যদপ্তর, পুলিশ প্রশাসন যুক্ত। যার মধ্যে অকুস্থলের নিকটবর্তী অংশ ভেঙ্গে ফেলা এবং ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রিন্সিপালকে সরকারীভাবে আড়াল করার চেষ্টা, হাসপাতালে গুণ্ডাদের ভাঙচুর করতে দেওয়া (পুলিশের তরফে কোন

বাধাদান করা হয় না) এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক ভাবে শাসক দলের তরফ থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা - সবই ঘটেছে এই কদিনের মধ্যে।

এই দুইটি পৃথক অপরাধকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে প্রথমতঃ কর্মক্ষেত্রে খুন ও ধর্ষণের ঘটনা কিন্তু একেবারেই নতুন। ডিউটিরুমে কোন মহিলা চিকিৎসক এমন অপরাধের শিকার হয়েছেন তেমন উদাহরণ বিশেষ মনে পড়ে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাস্তাঘাটে, বাড়িতে, মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনার অনেক উদাহরণ থাকলেও কর্মক্ষেত্রে তাও আবার কোন একটি মেডিকেল কলেজের মতো সুরক্ষিত স্থানে সবার অজান্তে এহেন অপরাধ ঘটানো আমাদের অজানা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য একটি আপাত দুশ্চরিত্র 'সিভিক' পুলিশকে এই কর্মের জন্য ঘটনার একদিন পরেই পুলিশ আটক করে এবং তাকেই মূল অভিযুক্ত বলে দাবী করে। ফরেনসিক শাস্ত্রের স্বল্প জ্ঞান থাকা যে কোন ব্যক্তি বা চিকিৎসক জানেন যে কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে সুস্থ-সবল একটি তরুণীকে গায়ের জোরে ধর্ষণ করা সহজ নয়। এবং মদ্যপ অবস্থায় তো কখনোই নয়। নিহত চিকিৎসকের শরীরে যে ধরণের ক্ষত ইত্যাদির বিবরণ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তাতে একাধিক ব্যক্তির জড়িত থাকার সম্ভাবনা প্রবল। এমতবস্থায় একটি বিষয় তো নিশ্চিত করে বলা যায় একাধিক ব্যক্তি, পরিকল্পিত ভাবে সকলের অলক্ষ্যে এই নারকীয় ঘটনা ঘটিয়েছে, সুতরাং এটি কোন হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয় বরং ভিতরের মানুষজনের যোগসাজসে এটা পরিকল্পিত হত্যা। সেক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে যেটা কিনা রেসিডেন্ট চিকিৎসকদের নিকট দ্বিতীয় গৃহের তুল্য সেখানকার নারী সুরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলার শুধু অবনতি নয় একেবারে চরম ব্যর্থতার পরিচায়ক।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় অপরাধের দিকে— তথ্য প্রমাণ লোপাট। এই বিষয়টা যেদিকে প্রথম অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তা হলো খুনের মোটিভ নিয়ে। বিগত কয়েক বছর ধরেই মূলতঃ এই ঘটনার সময় যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন আরজি কর হাসপাতালে সেই সন্দীপ ঘোষের আমলে বহু দুর্নীতি, অন্যায়ের খবর ওয়াকিবহল মহল জানেন। বিষয়টি নিয়ে বহুবার জলঘোলা হয়েছে।, হাসপাতালের ভিতরে দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরাও অভিযোগ জানিয়েছিলেন কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তার কোন শাস্তি

হয়নি। চাপের মুখে তাকে সরাতে বাধ্য হলেও কয়েকদিনের মধ্যেই আবার তিনি স্বপদে বহাল হন। অভয়ার মৃত্যু সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রেও সঠিক সময়ে এফআইআর না করা, ভুল তথ্য দেওয়া, মৃতার পরিবারের সঙ্গে চরম অমানবিক ব্যবহার এবং মৃতদেহ যেখানে উদ্ধার হয় তার নিকটবর্তী জায়গায় দেওয়াল ভেঙে পুণর্গঠনের কাজ শুরু করা - এইসকল অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তার রিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তর তার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। শুধু তাই নয় প্রবল ছাত্র বিক্ষোভের মুখে আরজি কর হসপিটাল থেকে সরিয়ে তাকে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষ পদে বহাল করা হয়। অবশেষে উচ্চ আদালতের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে তিনি কাজে যোগ না দিয়ে ছুটিতে যান। তাই কে এই সন্দীপ ঘোষ তা আজ প্রশ্ন উঠছে। কেন তিনি শাসকদলের অপরিহার্য? কেন তাকে শাসকদল এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করেও রক্ষা করতে তৎপর? তাহলে কি কোন বৃহৎ এবং ঘৃণ্য দুর্নীতির কেন্দ্রে আছেন এই সন্দীপ ঘোষ, যিনি শাসকদলের তথা মন্ত্রীর বিপদের কারণ হতে পারেন? কারা জড়িত আছে এই অভয়ার মৃত্যুর পিছনে যাদের বাঁচাতে সন্দীপ ঘোষ সদা তৎপর? তাই প্রশ্ন ঘনীভূত হয় যে পরিকল্পিত হত্যার কথা মনে হচ্ছে তা কি এই দুর্নীতির সঙ্গেও যুক্ত এবং তার জন্যই সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সন্দীপ ঘোষকে বাঁচানো এবং প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা। এই আশঙ্কা আরও দৃঢ় হয় যখন এই সময় পুলিশের, মূলতঃ পুলিশের কিছু উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিভ্রান্তমূলক বক্তব্য এবং অসংবেদনশীল আচরণের মাধ্যমে ঘটনাস্থল সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা। মৃতদেহ যে ঘরে আছে তাকে সম্পূর্ণ সিল না করা। এফআইআর হওয়ার আগে দেহ দাহ করতে দেওয়া। ১৪ অগাস্টের রাত্রিবেলা প্রায় ইচ্ছাকৃত ভাবে গুন্ডাদের আরজি কর হাসপাতালে তান্ডব চালাতে দেওয়া। প্রায় সব প্রমাণ লোপাট এবং তদন্তকে দিকভ্রান্ত করার অপচেষ্টা যাতে আদালতের নির্দেশে তদন্তে সিবিআই সহজে সত্যের কাছে পৌঁছতে না পারে।

পুরোটা দেখে মনে হয় পুলিশ দপ্তর এবং স্বাস্থ্যদপ্তর উভয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করছে। সেক্ষেত্রে সন্দেহ আর দৃঢ় হয়, কে এই দুর্নীতির কান্ডারি কারণ উভয় দফতরের মন্ত্রী কিন্তু একজনই।

এক দেশ এক নির্বাচন

সাহানা মুখোপাধ্যায়

কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম-সহ বিজেপি-বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলির আশঙ্কা, 'এক দেশ এক ভোট' নীতি কার্যকর হলে লোকসভার 'ঢেউয়ে' বিধানসভাগুলি 'ভেসে যাবে'। যদিও তাঁরা সবাই জানেন, এই নীতি কার্যকর হলে যে বিপুল পরিমাণ টাকা বাঁচবে তা আসবে দেশের অর্থনীতিতে। যা থেকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে। যদিও দেশের উন্নয়নের থেকে বিরোধীদের অনেক বেশী মাথাব্যাথা ক্ষমতা আর গদি নিয়ে।

'এক দেশ এক নির্বাচন' কার্যকর হলে ভারত এ ব্যাপারে বিশ্বের চতুর্থতম দেশ হিসেবে স্থান লাভ করবে ইতিহাসের ক্যানভাসে। এখনও পর্যন্ত একযোগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার দেশগুলির মধ্যে রয়েছে বেলজিয়াম, সুইডেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। এর পরে জুড়বে ভারতের নাম।

সবকিছু ঠিকমতো এগোলে গোটা বিশ্ববাসী দেখবে মোদী সরকারের আরও এক ক্যারিশমা। ২০২৯ সালে একযোগে বিধানসভা, লোকসভা ও পুরসভা স্তরের নির্বাচনগুলি একই সঙ্গে ঘটবে। কারণ আমাদের দেশে নির্বাচন মানেই শুধুমাত্র নিছক মতদান নয়। নির্বাচনকে বলা হয় গণতন্ত্রের উৎসব। সেই গণতন্ত্রকে সসম্মানে বাঁচানোর তাগিদে দেশের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বদ্ধপরিকর। বলা ভালো জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে হঠাৎ কেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন পড়ল এই নীতিকে এখনই বাস্তবায়িত করবার? কেন এ বছর থেকেই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তৎপর হয়ে ওঠা?

'এক দেশ এক ভোট'- নীতিকে লক্ষ্য করে সমস্তরকম বোঝাপড়া ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় নেমে পড়া? আশার কথা হচ্ছে এটাই যে, এই সিদ্ধান্ত একদমই চটজলদি বা তাৎক্ষণিকভাবে নেওয়া হয়নি। ২০১৯ সালে দ্বিতীয় বার কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর 'এক দেশ এক নির্বাচন' চালু করার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২৪-এর ১৭ সেপ্টেম্বর ১০০ দিনে পদার্পণ করেছে তৃতীয় এনডিএ সরকার।

আর সেদিনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ 'এক দেশ এক ভোট'- সংক্রান্ত বিষয়ে ঘোষণা করেন এবং বর্তমান সরকারের কার্যকাল মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই 'এক দেশ এক নির্বাচন' চালু হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, শেষ তিনটি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ইস্তাহারে 'এক দেশ এক ভোট'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে কেন্দ্র এগিয়ে চলেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে এই ইস্যুতে সমাধানসূত্র পেতে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করে কেন্দ্র। যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ, রাজ্যসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা শ্রী গুলাম নবী আজাদ, শ্রী এন কে সিং - প্রাক্তন চেয়ারম্যান ১৫তম অর্থ কমিশন, ড. সুভাষ সি. কাশ্যপ- প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল লোকসভা, সিনিয়র অ্যাডভোকেট শ্রী হরিশ সালভে, প্রাক্তন চিফ ভিজিলেন্স কমিশনার শ্রী সঞ্জয় কোঠারি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন সিং মেঘাওয়াল (বিশেষ আমন্ত্রিত) সহ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। 'এক দেশ এক নির্বাচন' চালু করবার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী ২০২৯ সালের মধ্যেই চালু হবে 'এক দেশ এক ভোট'। অর্থাৎ, নিয়ম কার্যকর হলে সারা দেশে একসঙ্গে লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনের আয়োজন করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেইসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের সভাপতিত্বে গঠিত নির্বাচন সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ২ সেপ্টেম্বর মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে ১৮৬২৬ পৃষ্ঠা সমন্বিত একটি প্রতিবেদন পেশ করে।

দেখা গিয়েছে, ১৯৮৬ সালের পর থেকে এমন একটা বছর নেই বিধানসভা নির্বাচন হয়নি। কোনও না কোনও রাজ্যে ভোট প্রক্রিয়া চলেছেই। এর মধ্যেও আবার পাঁচ বছর অন্তর লোকসভা বা পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচন তো আছেই। সেই কারণে ১৪০ কোটি মানুষের ভারতে 'এক দেশ এক নির্বাচন'- নীতিতে অন্যতম লাভ হবে সাধারণ মানুষের। বারবার জুলুমবাজি, মারামারি, হানাহানি, রক্তপাত ও সন্ত্রাস কারণে তৈরি অস্থিরতাকে রোধ করা যাবে একযোগে নির্বাচন পর্ব সমাধা হলে। শুধু তাই নয়, কোনও কোনও রাজ্যে বিধানসভা ভোটে নিরীহ মানুষের কাছ থেকে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার মতো অপরাধ প্রবণতা রোধ করে সাধারণ জনগণের মধ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুরোপুরি উৎসবের মেজাজ পর্যবসিত হবে। স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সঙ্ঘটিত নির্বাচনের অর্থ গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, দেশের অর্থনৈতিক দিকটিও ভাববার বিষয়। 'এক দেশ এক নির্বাচন' হলে অবশ্যই সুফল পাবে ভারতীয় অর্থনীতি।

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতে নিবন্ধিত ভোটার সংখ্যা ৯৬ কোটি ৮০ লাখ। এরমধ্যে ৬৪ কোটি ২০ লাখ ভারতীয় নাগরিক ভোট দিয়েছেন, যা নতুন বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ভোটদাতাদের প্রায় অর্ধেক (৩১ কোটি ২০ লাখ) ছিলেন নারী। ২০২৪-এ সাত দফায় ভোট হয়েছে। এসব বাদ দিয়েও অন্যান্য লজিস্টিক ব্যয় তো ছিলই। অতএব ভোট বৈতরণী পেরোতে নির্বাচন কমিশন ও ভারত সরকারের এই রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তা সহজেই অনুমেয়।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ১.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এটি ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যয়কেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেখানে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১.২ লাখ কোটি টাকা। নির্বাচনে এই ব্যয়ের বহর, অর্থনীতিবিদদের মতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ। যা থেকে বোঝা যায় , কী পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

অথচ ২০২২ সালে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের জন্য প্রার্থী প্রতি ব্যয়ের ঊর্ধ্বসীমা সংশোধন করে নির্দিষ্ট করে বেঁধে দিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী ৯৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারেন। অন্যদিকে রাজ্য অনুযায়ী বিধানসভা নির্বাচনে একটি কেন্দ্রের জন্য নির্বাচন কমিশন সেই সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে ২৮ থেকে ৪০ লক্ষ। তাও রাজ্যের বিধানসভা কেন্দ্র ও লোকসভা কেন্দ্রের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী। যেমন অরুণাচলের মতো ছোটো রাজ্যে বিধানসভা কেন্দ্রের একজন প্রার্থী ২৮ লক্ষ এবং লোকসভা নির্বাচনে একজন প্রার্থী ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবেন। খরচের সীমা শুধুমাত্র প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য হবে তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করবার পরে। প্রচার খরচ যেমন জনসভা, সমাবেশ, বিজ্ঞাপন এবং পরিবহণ ওই সীমার মধ্যেই পরিগণিত হবে। কিন্তু বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল খরচের সীমা রক্ষার বাধ্যবাধকতা বা দায়বদ্ধতা পালন করে না। বিশেষ করে রাজ্যের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি।

সালতামামির জন্য পিছনদিকের পরিসংখ্যান দেখলে জানা যায়, ১৯৫১ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। সেসময়ে প্রার্থীরা ২৫,০০০ টাকা খরচ করতে পারতেন। ২০২৪ সালে বেড়ে হয়েছে ৭৫-৯৫ লক্ষ টাকা, যা তুলনায় ৩০০ গুণ বেশি। সামগ্রিক নির্বাচনী ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৮ সালে খরচের পরিমাণ ছিল ৯০০০ কোটি টাকা। সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজ অনুসারে, ভারতে একক ভোটের মূল্য এখন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালের নির্বাচনে খরচ হয়েছে ৫৫,০০০-৬০,০০০ কোটি টাকা। প্রায় ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে খরচের নমুনা।

সমস্ত নির্বাচন একযোগে হলে শুধুমাত্র গড়ে জিডিপি ১.৪ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে তাই-ই নয়, এই অঙ্ক ২০২৪ ফিনান্সিয়াল বছরে ধার্য বিভিন্ন উন্নতি প্রকল্পের ৪.৫ লক্ষ কোটি টাকার সমতুল। বিশেষজ্ঞদের মতে এই ৪.৫ লক্ষ কোটি

টাকা অর্ধেকটা বহন করতে সক্ষম হবে স্বাস্থ্য এবং এক তৃতীয়াংশ শিক্ষা খাতে। এছাড়াও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বাধীন কমিটি মনে করছে একযোগে ভোটের ফলপ্রসূ হিসেবে মুদ্রাস্ফীতি কম, উচ্চ বিনিয়োগ এবং তুলনামূলকভাবে সরকারি খাতে ব্যয় কম হবে। একই সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতিতে স্থিরতা আসবে। এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে অর্থাৎ স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তিতে ভারতকে একটি উন্নত অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে রূপান্তরিত করবার জন্য, নিম্ন মুদ্রাস্ফীতি, উচ্চ বিনিয়োগ - একযোগে নির্বাচনের মূল বিষয়।

এতো গেল ভোটে বিপুল খরচের মোটামুটি একটা হিসেব। কিন্তু এই 'one nation, one poll' নীতিরও একটা ইতিহাস রয়েছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচন কমিশন একযোগেই লোকসভা ও বিধানসভা ভোট সম্পাদন করেছিল। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলেও ন'টি রাজ্যে হেরে যায় দেশের সবচেয়ে পুরনো ও জাতীয় দল কংগ্রেস।

এ দিকে আবার ১৯৭০ সালে লোকসভা ভেঙে দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ফলে একসঙ্গে ভোটের চক্রটি ওলটপালট হয়ে যায়। যার অশুভ পরিণতি হিসেবে ১৯৬৭ সালের পর থেকে আর কখনওই একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন হয়নি। এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি, বর্তমানে 'এক দেশ এক নির্বাচন'- চালু করতে হলে সংবিধানে মোট ১৮টি সংশোধন করতে হবে। যার অনেকগুলিতেই রাজ্য বিধানসভার সম্মতির প্রয়োজন। ফলে ২০২৯ সালের মধ্যে এই প্রক্রিয়া আদৌ চালু করা যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দিহান ওয়াকিবহাল মহল।

উপরন্তু এ বছরের লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। ভোটে বিজেপির পাওয়া আসনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪০। যদিও রাজ্যসভায় আরও শক্তি বাড়িয়েছে বিজেপি। বিশেষজ্ঞদের দাবি, 'এক দেশ এক ভোট' পরিকল্পনাকে ২০২৯ সালের মধ্যে চালু করতে হলে, এখন থেকেই সমস্ত প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সে ক্ষেত্রে প্রথমে লোকসভা ও বিধানসভার সময়কাল সংক্রান্ত যে সাংবিধানিক রীতিনীতি রয়েছে, তার সংশোধন করতে হবে। তার পর বেশ কয়েকটি বিধানসভাকে কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভেঙে দিতে হবে।

২০২৩ সালে ১০টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল। সেগুলি হল, হিমাচল প্রদেশ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, কর্নাটক, তেলঙ্গানা, মিজোরাম, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ় ও রাজস্থান। এই রাজ্যগুলিতে ভোট হওয়ার কথা ২০২৮ সালে। অন্যদিকে, ২০২৬ সালে বাংলা, অসম, তামিলনাড়ু ও কেরল এবং ২০২৭ সালে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত ও পঞ্জাবে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে।

'এক দেশ, এক ভোট' করতে হলে এই রাজ্যগুলির বিধানসভা কিছুটা আগে ভেঙে দিয়ে সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করতে হবে। অথবা, এই সমস্ত রাজ্যগুলির বিধানসভার কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও পন্থা অবলম্বনের কথা বলেনি কোবিন্দ কমিটি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৮৩ ও ১৭২ নম্বর অনুচ্ছেদে যথাক্রমে লোকসভা ও বিধানসভার কার্যকালের মেয়াদের কথা বলা হয়েছে। 'এক দেশ এক নির্বাচন'-চালুর জন্য সেখানে সংশোধনের সুপারিশ করেছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটি।

কমিটি ৮৩ এবং ১৭২ ধারায় বিভিন্ন সংশোধনির পাশাপাশি ৮২এ ধারাও সংযোজনের প্রস্তাব করেছে। কাজটি কার্যকর করার জন্য অন্যান্য বিধানও রয়েছে। কমিটি সুপারিশ করেছে, সমস্ত রাজনৈতিক দলের ২০২৯ সাল থেকে একযোগে নির্বাচন কার্যকর করতে সম্মত হওয়া উচিত। এটি লোকসভা নির্বাচনের ১০০ দিনের মধ্যে পুরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলির জন্য একযোগে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। সব নির্বাচনের জন্য একটি সাধারণ ভোটার তালিকা থাকা উচিত। পৌরসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য, কমিটি সংবিধানে সংশোধনির প্রস্তাব করেছে, যার জন্য ৫০ শতাংশ রাজ্যের বিধানসভাগুলির অনুমোদন প্রয়োজন।

নির্বাচনী ব্যয়ের বহর দেখাতে গিয়ে সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজের একটি রিপোর্টে ধরা পড়েছে এক রাক্ষুসে চিত্র। যেমন ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের প্রথম নির্বাচন ৬৮টি ধাপে ঘটেছিল। ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১০.৫ কোটি টাকা। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯৮ এবং ২০১৯ সাল থেকে ২০ বছরে নির্বাচন-কেন্দ্রিক ব্যয় ছয় গুণ বেড়ে গিয়েছে এবং খরচ ৯০০০ কোটি টাকা থেকে ২০১৯ সালে তা ৫০,০০০-৬০,০০০ কোটিতে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৮৬ সাল থেকে এমন একটি বছর যায়নি যে নির্বাচনের দামামা বাজেনি। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতে নিবন্ধিত ভোটার সংখ্যা ৯৬ কোটি ৮০ লাখ। এরমধ্যে ৬৪ কোটি ২০ লাখ ভারতীয় নাগরিক ভোট দিয়েছেন, যা নতুন বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ভোটদাতাদের প্রায় অর্ধেক (৩১ কোটি ২০ লাখ) ছিলেন নারী। সরকারি হিসেব অনুযায়ী ২০১৯ সালে একটি ভোটের জন্য খরচ হয়েছিল ৭০০ টাকা। ২০২৪ তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪০০ টাকা।

বিশেষজ্ঞরা আরও উল্লেখ করেছেন যে, লোকসভা নির্বাচনের মাত্রা বিবেচনা করে নির্বাচনের ক্রমবর্ধমান ব্যয় দেশের অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বিধানসভা নির্বাচন বাদ দিয়েও একটি লোকসভা নির্বাচন মানে প্রচুর লোকবল প্রয়োজন। সবদিক থেকে বিবেচনা করে, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে নতুন ভারতে 'এক দেশ এক নির্বাচন' ছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় উপায় নেই।

রাহুল গান্ধী কি ভারতের জেলেনেস্কি হতে চান?

সৌভিক দত্ত

বালক রাহুলের কাজকর্ম যতই হাস্যকর এবং অপরিপক্ক হোক না কেন, তার দলবলকে নিয়ে একদমই নিশ্চিত থাকা যাবে না। আমরা সতর্ক না হলেই আমাদের রাষ্টের সামনে বড়সড় বিপদ অপেক্ষা করে আছে - ৩.৫%-এর টুলকিট গ্যাং।

একজন রাষ্ট্রনায়ক বা এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, তার অন্যতম প্রধান শর্তই হওয়া উচিত দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক পরিপক্কতা। এবং এই রাজনৈতিক পরিপক্কতা আসার পেছনে অন্যতম বড় ফ্যাক্টর হল মানসিক পরিপক্কতা। আর সেটা যদি কারো মধ্যে না থাকে তার পক্ষে কখনোই একটি দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল পদে আসীন হওয়া সম্ভব নয়। আর যদি কোনভাবে সে তা পেয়েও যায়, তা সে পারিবারিক ক্ষমতার দ্বারা হোক বা কোন বিদেশি শক্তির সহায়তায় হোক বা কোন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই হোক - সে আদতে নিজের পদের মর্যাদা, নিজের আশেপাশের সবকিছু এবং সবশেষে নিজের দেশকেই ধংস করে দেয়। হাল আমলে যার সম্ভবত সবথেকে নির্ভুল উদাহরন হলো ইউক্রেনের কমেডিয়ান রাষ্ট্রপতির হাতে সেই দেশের চরমতম বিপদ ঘনিয়ে আসা। রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা এগুলো আর যাই হোক ছুটির দিনে পারিবারিক লুডো খেলা নয়, এটা সবারই মনে রাখা উচিত।

সম্প্রতি রাহুল গান্ধী আমেরিকায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী, আরএসএস ইত্যাদির নামে নালিশ টালিশ করে এসেছে। সাথে এক শিখ ভদ্রলোককে সাক্ষী বানিয়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে সারা ভারত জুড়ে শিখ সম্প্রদায়ের কাছে ধমক খেয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। খোদ নরেন্দ্র মোদী সবাইকে সাবধান করে দিয়েছে এদের ধারেকাছে থাকতে। মানে দেশে পাত্তা পায় না বলে বিদেশে গেছিলো কান্নাকাটি করতে, লাভের মধ্যে এখন সবার কাছে বকাঝকা খেয়ে বেড়াচ্ছে।

ভার্জিনিয়ার হের্নডনে ভারতীয় আমেরিকানদের এক সমাবেশে রাহুল গান্ধী আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ)-এর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। তার অভিযোগ এই ছিলো যে তাঁরা (আরএসএস) কিছু ধর্ম, ভাষা ও সম্প্রদায়কে অন্যদের তুলনায় নীচু হিসেবে বিবেচনা করে। এবং ভারতের লড়াইটা নাকি শুধুমাত্র রাজনীতি নিয়ে নয় বরং এইসব বৈষম্য ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে। আর এই নলিশটাকে আরেকটু পাকাপোক্ত ভিতের উপরে দাঁড় করানোর প্রয়াসে তার ইচ্ছা হয় একটা উদাহরণ দেওয়ার। আর এই উদাহরণ দিতে গিয়েই তিনি এক শিখ ভদ্রলোককে দেখে তার নাম জিজ্ঞেস করেন। তারপর তিনি দর্শকদের বলেন যে ভারতের বর্তমান লড়াই হল শিখরা তাদের পাগড়ি পরতে পারবেন কিনা, বা কড়া পরতে পারবেন কিনা। অথবা, তিনি শিখ হিসেবে গুরুদ্বারে যেতে পারবেন কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর এতেই বেরিয়ে এসেছে তার রাজনৈতিক অপরিপক্কতা।

কারন আমরা সবাই জানি যে ১৯৪৭ এর পর থেকে এই ২০২৪ সাল পর্যন্ত মাত্র একবারই এমন সময় এসেছে যখন শিখদের নিজের পরিচয় লুকিয়ে ঘুরতে হয়েছিল। যখন তারা গুরুদ্বারে যেতে পারেনি, তারা তাদের ধর্মীয় চিহ্ন পরিধান করতে পারেনি। আর সেটা হলো, যখন তাঁর নিজের ঠাকুমা, ইন্দিরা গান্ধী নিহত হয়েছিলেন। শুধুমাত্র রাজধানী দিল্লিতেই ৩০০০ এরও বেশি

শিখকে সেইবার হত্যা করা হয়। তার বাবা অর্থাৎ রাজীব গান্ধী নির্মমতার চূড়ায় উঠে এই গণহত্যা সম্পর্কে বলেছিলেন - যখন একটি বড় গাছ পড়ে, পৃথিবী কেঁপে ওঠে। এটাই প্রথম নয়, এর আগেও 'বালক বুদ্ধি' রাহুল গান্ধী এমন আচরণ করেছেন। লোকসভা নির্বাচনের পর পরই তিনি সংবিধান নিয়ে অতিরিক্ত ভালোবাসা দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, স্বাধীনতার পরে মাত্র একবারই সংবিধান বিপদাপন্ন হয়েছিল, যখন ১৯৭৫ সালে, যখন তাঁর নিজের ঠাকুমা, ইন্দিরা গান্ধী, জরুরি অবস্থা জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমেরিকায় আরও একটি ঘটনা ঘটেছে যা নিয়ে মুখ খুলেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোদি। রাহুলের ছায়াসঙ্গী, কংগ্রেসের পররাষ্ট্র বিষয়ক সেলের প্রধান সাম পিত্রোদাকে এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন যে, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে রাহুল গান্ধী কেন কোনও প্রতিক্রিয়া দিলেন না। তিনি তো বিরোধী দলনেতা। এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সাম অস্বস্তিতে পড়ে যান। উত্তর এড়িয়ে যান।

পরে রাহুলের দলবল অর্থাৎ তাঁর রক্ষী ও ভিডিও টিম সঙ্গে সঙ্গে সেই সাংবাদিকের ক্যামেরা ও মোবাইল কেড়ে নিয়ে গোটা ইন্টারভিউ ডিলিট করে দেয়। প্রধানমন্ত্রী জম্মু-কাশ্মীর ও হরিয়ানায় বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে এক ভাষণে বলেন, "আমেরিকায় কী হয়েছে আমি কাগজে পড়েছি। আমি এই ঘটনার নিন্দা করছি এবং সাংবাদিক বন্ধুদের বলছি কংগ্রেসের নেতাদের থেকে সাবধানে থাকবেন।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি রাহুল গান্ধী সম্পর্কে বলেছেন যে, রাহুল বিদেশে "সংবেদনশীল বিষয়" নিয়ে কথা বলে একটি "বিপজ্জনক ধারা" তৈরির চেষ্টা করছেন। তিনি স্পষ্ট অভিযোগ তোলেন যে, তিনি মনে করেন কূটনৈতিক কারণে রাহুল গান্ধী তার (হরদীপ পুরীর) সম্প্রদায়ের সামনে মিথ্যে ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। দিল্লিতে রাহুলের বাড়ির সামনে বিক্ষোভও দেখায় শিখ সম্প্রদায়।

তবে হ্যাঁ এখানে সতর্ক থাকার মতো ঘটনাও আছে। কারণ দা মিন্ট এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভার্জিনিয়ায় এই অনুষ্ঠানে প্রো-খালিস্তানি লোকজন উপস্থিত ছিল। রিচমন্ড হিলের বাবা মাখন শাহ গুরুদ্বারের প্রতিনিধিরা ওই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন, যে গুরুদ্বার কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ভারত-বিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। এই গুরুদ্বারের প্রতিনিধিরা টাইমস স্কোয়ারে বিচ্ছিন্নতাবাদী অমৃতপাল সিংকে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। তারা বাবা মাখন শাহ গুরুদ্বার থেকে নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার পর্যন্ত একটি গাড়ি র‍্যালি বের করেছিল। যেখানে ভারত বিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, টাইমস স্কোয়ারের বিলবোর্ডগুলোও ভারত-বিরোধী প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। খালিস্তানি সন্ত্রাসী গুরপতবন্ত সিং পান্নুনও রাহুল গান্ধীর মন্তব্যে সমর্থন জানিয়েছে। হিন্দুস্তান টাইমস পান্নুনের উদ্ধৃতি দিয়ে রিপোর্ট করেছে।

তাই আমাদের সতর্ক থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। সতর্ক থাকার অবশ্য আরো ভয়াবহ কারণ আছে। এই যে লোকটার চারপাশে খালিস্তানি বা অন্যান্য দেশ বিরোধীরা ঘুরঘুর করে - এটা কিন্তু যথেষ্টই বিপজ্জনক। আমরা হয়তো ভাবতে পারি যে এই টুলকিট গ্যাং আর কত জনের? সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন তো দেশের পক্ষেই আছে এবং বছর বছর তা প্রমাণিতও হচ্ছে। তাহলে আমাদের ভয় পাওয়ার কি কোনো কারণ আছে?

উত্তর হল যে, আছে।

এক্ষেত্রে আপনাদের পরিচয় করাব জিন শার্প-এর ৩.৫% নিয়মের সাথে। ভারতসহ পৃথিবীর যাবতীয় টুলকিট গ্যাং এই নিয়মই ব্যবহার করে সরকার পরিবর্তনের জন্য। ঠান্ডা যুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশে জিন এই পদ্ধতিকে সফলভাবে ব্যবহার করেছেন। ৩.৫% নিয়ম অনুযায়ী, একটি দেশে শাসন পরিবর্তন করতে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রয়োজন নেই। একটি ক্ষুদ্র কিন্তু ডেডিকেটেড কিছু মানুষই যথেষ্ট — জিন শার্প বিশ্বাস করেন যে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩.৫ শতাংশই এটি করতে পারে।

জিন তাঁর বই The Politics of Nonviolent Action-এ দেখিয়েছেন শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করার জন্য দুটো জিনিস প্রয়োজন। প্রথমত আন্দোলনটিকে হতে হবে তথাকথিত অহিংস, কারণ এতে সাধারন নিরপেক্ষ মানুষের নৈতিক সমর্থন জোটে। আর দ্বিতীয়ত আন্দোলনের কৌশল হবে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। তাতে তিনি তার অনুসারীদের প্রতীকী রঙ ব্যবহার করতে, শোভাযাত্রা, মোমবাতি প্রজ্জ্বলন, ইংরেজিতে লেখা ব্যানার (যাতে আন্তর্জাতিক মনযোগ পাওয়া যায়), পুরস্কার দেওয়া, অর্থনৈতিক বয়কট, অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা এবং ধর্মঘটের মতো কৌশল ব্যবহার করতে বলেন। এছাড়াও মানুষের মনে জায়গা করে নিতে অনশনও এই ৩.৫% গ্যাং এর অন্যতম বড় হাতিয়ার।

বিগত কিছু বছরের নানা কার্যক্রমের সাথে এই নিয়মের কোনো মিল পাচ্ছেন কী? যদি পান তাহলে আপনাকে স্বাগত, আপনার ভাবনাচিন্তা একেবারে সঠিক পথেই এগোচ্ছে। আমরা আদতে একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্রের মধ্যে বাস করছি। যেখানে আঙুলে গোনা কয়েকজন মানুষ অনায়াসে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার ফেলে দেওয়ার মিশন চালাতে পারে, কারণ বাকি জনগণ শুধুমাত্র নির্বাচনের দিনে ভোট দান করেই নিজেদের গণতান্ত্রিক কর্তব্য সমাধা হয়েছে বলে মনে করে। আর তাই রাহুলের কাজকর্ম যতই হাস্যকর এবং অপরিপক্ক হোক না কেন, তার দলবলকে নিয়ে একদমই নিশ্চিত থাকা যাবে না। আমরা সতর্ক না হলেই আমাদের রাষ্ট্রের সামনে বড়সড় বিপদ অপেক্ষা করে আছে।

ছবিতে খবর

আরজি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে রাজ্য বিজেপির ২৪ দিনের টানা ধর্না-অবস্থানের শেষ দিনে ধর্মতলায় বিজেপি রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

তিলোত্তমার নৃশংস হত্যার বিরুদ্ধে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে দমদম নাগেরবাজার মোড় থেকে সেন্ট মেরীস স্কুল পর্যন্ত বিক্ষোভ মশাল মিছিলে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ও অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব।

এবিভিপি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের নারী স্বশক্তিকরণ (মিশন সাহসী) কার্যক্রমের একটি মুহূর্ত।

নয়াদিল্লিতে বিজেপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সদস্যতা অভিযানের পর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

বীরভূম জেলা সদস্যতা অভিযান কর্মশালায় রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জির জন্মদিনে মুরলীধর সেন লেন রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে "নরেন্দ্র মোদী -চিত্রায়ণে জীবনকথা" শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুরে সদস্যতা অভিযানের সংগঠন পর্বে শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী, শ্রী সুনীল বনসল, শ্রী শমীক ভট্টাচার্য এবং শ্রী জ্যোতির্ময় সিং মাহাত।

হিঙ্গলগঞ্জ ২নং মন্ডলের সদস্যতা অভিযান মন্ডল বৈঠক।

গাজোল মন্ডল-২ এর মন্ডল সদস্যতা অভিযানের বিশেষ বৈঠক।

ছবিতে খবর

রাজ্যের মহিলাদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার এবং আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে বিজেপি কলকাতা উত্তর জেলার ডিসি সেন্ট্রাল ঘেরাও অভিযান।

উত্তর কলকাতা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ডিসি সেন্ট্রাল (ক.পু.) ঘেরাও অভিযান।

হরিপালে নাবালিকার ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দোষীদের শাস্তির দাবিতে হরিপাল থানার সামনে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচি।

রাজ্য জুড়ে মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে কলকাতার গড়িয়াহাট মোড়ে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার মানববন্ধন কর্মসূচি।

রাজ্য জুড়ে মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে জলপাইগুড়ি সদর ব্লক অফিসে বিজেপির ধর্না অবস্থান।

রাজ্য জুড়ে মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে পুরশুড়া ব্লকের সামনে বিজেপির ধর্না অবস্থান।

রাজ্যের মহিলাদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার এবং আরজি কর হাসপাতালে নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে রাজ্যের প্রতিটি মণ্ডলে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির চাক্কা জ্যাম কর্মসূচী।

রাজ্যের মহিলাদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার এবং আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে জেলায় জেলায় ব্লক অফিসে বিজেপির ধর্না অবস্থান।

ছবিতে খবর

রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে গাজনা মাঠপাড়া, ঘাটাল লোকসভা, পাঁশকুড়া ও দাসপুরের বিভিন্ন এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য 'ভাষণ নয়' সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন শ্রী শান্তনু ঠাকুর, শ্রী সুকান্ত মজুমদার, শ্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির অসংখ্য নেতাকর্মী। পানীয় জল এবং রান্না করা খাবার নিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে এসেছিল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীরা।

আরজি কর কান্ডে বিচার চাই, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই! রাজ্যের প্রত্যেক এসডিপিও অফিসে পুলিশের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিজেপি মহিলা মোর্চার ডাকে থানা শুদ্ধিকরণ অভিযান কর্মসূচি।

আরজি কর মেডিক্যালে নির্যাতিতা ডাক্তার বোনের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে এবং নৈহাটিতে প্রতিবাদীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে তৃণমূলী গুণ্ডাদের আক্রমণের প্রতিবাদে বিজেপি ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার ডাকে ধিক্কার মিছিল।

লাঙল গ্রামের নাবালিকা ধর্ষক এরশাদ আলী এবং অভয়া কাণ্ডে যুক্ত দোষীদের গ্রেফতার ও কঠোর সাজার দাবিতে তুফানগঞ্জে পথ অবরোধে সাংসদ মনোজ টিগ্গা, বিধায়ক মালতী রাভা রায় এবং বিজেপির অসংখ্য কর্মী-সমর্থকগণ।

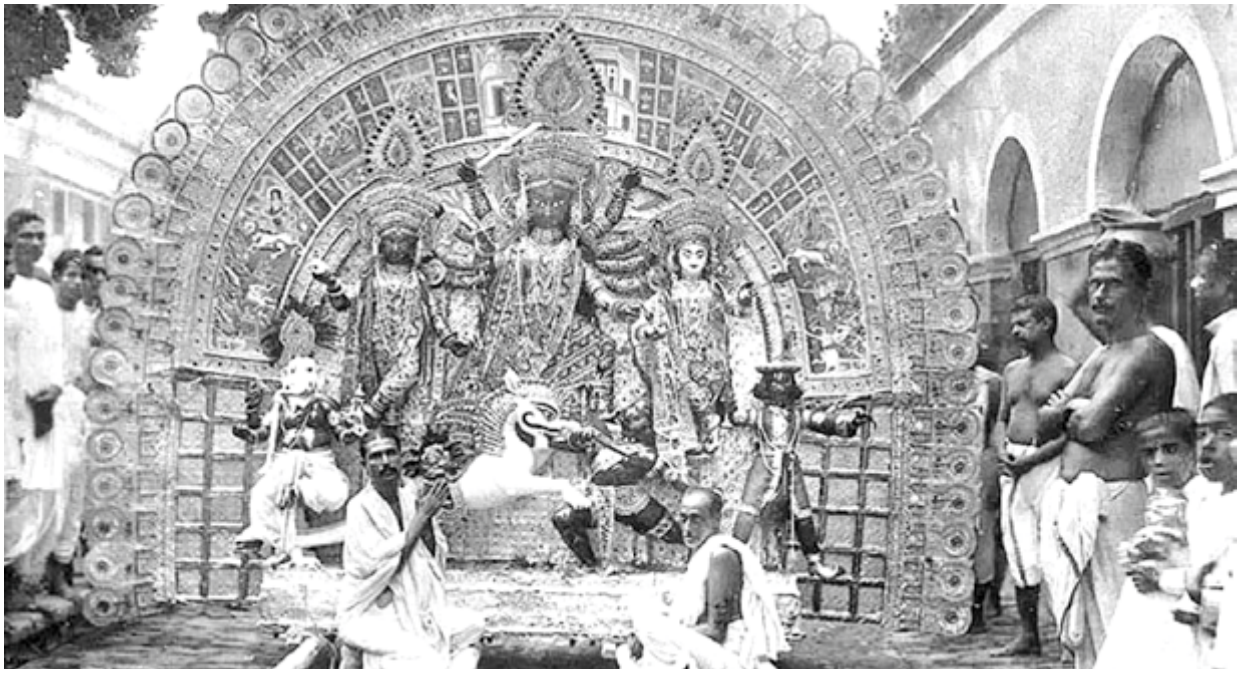

বাংলায় দুর্গাপূজার ইতিহাস

বিনয়ভূষণ দাশ

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে দুর্গা কন্যারূপী উমা; আবার তিনিই ভয়হারিণী, শক্তিরূপিণী-অসুর-দলনী-অভয়দাত্রী-দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা। তিনি আমাদের মধ্যে অসুরবিনাশী শক্তিরূপে বিরাজিতা। কাল থেকে কালান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে তিনি আছেন আমাদের অন্তরে।

সাম্প্রতিককালে শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রচলন নিয়ে অনেক বিভ্রান্তিকর মতবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। অনেকেই লিখছেন, বাংলায় প্রথম শরৎকালীন দুর্গাপূজা কৃষ্ণনগর অধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং তাঁর দেখাদেখি শোভাবাজার রাজবাড়ীর রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই পূজার প্রচলন করেন। হিন্দু বাঙ্গালীর দুর্গাপূজাকে খ্রিস্টান ইংরাজদের তুষ্টি করার একটা পন্থা বলে দেগে দিচ্ছেন বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধীরা। এটা ঠিকই, পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, শরৎকালে ওই দুজন দুর্গাপূজা করেন। ক্লাইভ যুদ্ধবিজয়ের অঙ্গ হিসেবে নিজে কোন গির্জায় উৎসব না পালন করে হিন্দুদের দুর্গাপূজায় আনন্দোৎসব করেছিলেন। কিন্তু সেটি কোনভাবেই বাংলার প্রথম শারদীয় দুর্গাপূজা ছিল না।

ভারতবর্ষে তথা বাংলায় ঠিক কবে দুর্গাকে দেবী হিসেবে অর্চনা করা শুরু হয় তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। তবে দুর্গাকে দেবী হিসেবে আরাধনা করার সুত্র পাওয়া যায় এদেশের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদের রাত্রিসুক্তমে,সামবিধান ব্রাহ্মণ অংশের তৃতীয় মণ্ডল, অষ্টম অনুবাকের দ্বিতীয় সুত্রে বলা হয়েছে,ওঁ রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূং ময়োভুং কন্যাং শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীমাদিত্যঃ শ্রীচক্ষুষে বান্তঃ প্রাণায় সোমো গন্ধায় আপঃ স্নেহায় মনঃ অনুজ্ঞায় পৃথিব্যৈ শরীরম অর্থাৎ যে ব্রহ্মরূপা মহামায়া বারবার অসুরবধের জন্য আবির্ভূতা হন, যিনি প্রাণীগণের সুখদাত্রী ও কন্যারূপিণী, যিনি শিখণ্ডিনী অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছভূষণা এবং অসুরবধার্থ পাশহস্তা এবং যিনি নিত্য বাল্য ও বার্ধক্যাবস্থা-রহিতা ও কুমারী প্রভৃতি শক্তিসমূহের সমষ্টিভূতা, সেই রাত্রিরূপা দেবীর শরণাপন্ন হই । তাঁর প্রভাবে সূর্য চক্ষুদ্বয়কে শ্রীযুক্ত করে রক্ষা করুন; বায়ুদেবতা পঞ্চ-প্রাণ রক্ষা করুন; সোমদেব ঘ্রাণেন্দ্রিয় রক্ষা করুন, বরুণদেব সকল তরল পদার্থ রক্ষা করুন; চন্দ্রদেব আমার মন রক্ষা করুন এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমার শরীর রক্ষা করুন। এই রাত্রিসুক্তে যে দেবীর কল্পনা করা হয়েছে তিনিই দেবী দুর্গার আদি রূপ।

আবার পঞ্চদশ শতকে কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর শ্রীরাম পাঁচালী বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন করে শরৎকালে দুর্গাপুজা করার কথা উল্লেখ করেন । দুর্গাপূজার মন্ত্রে বলা হয়েছে, “ রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিতা

দেবী। "মূল রামায়ণে শরৎকালে দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই। ওই পঞ্চদশ শতকেই, ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলার তাহেরপুরের জমিদার, রাজা কংসনারায়ণ প্রথম শ্রীরাম পাঁচালীর বর্ণনা অনুযায়ী শরৎকালে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। তাঁর এক পূর্বপুরুষ, কামদেব, ওই অঞ্চলের জমিদার তাহির খাঁকে পদচ্যুত করে জমিদারী লাভ করেন। কামদেব ছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই জমিদারী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার ছিলেন রাজা হরিনারায়ণের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ। কথিত আছে, কংসনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে খুব জাঁকজমক সহ বাংলায় প্রথম বর্তমান ধারার দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত ওই মন্দিরলিপিতেও এ কথার সাক্ষ্য মেলে। রাজা কংসনারায়ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সম্পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তিনি তাঁদের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর কাছে তিনি রাজসূয় যজ্ঞ বা ওই ধরণের কোন অনুষ্ঠান করতে অনুমতি চাইলে শাস্ত্রী মহোদয় তাঁকে দুর্গাপূজার বিধান দেন কারণ কলিযুগে কোন অধীনস্থ রাজা বা জমিদারের পক্ষে এটাই উত্তম পন্থা। পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজা কংসনারায়ণ ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেন। এই দুর্গাপূজা তিনি কবি কৃত্তিবাসের বর্ণনা অনুযায়ী শরৎকালে করেন। রাজা রামচন্দ্র লঙ্কারাজ রাবণবধকল্পে শরৎকালেই দেবি দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন। রাজা কংসনারায়ণকৃত শরৎকালের এই দুর্গাপূজাই সময়ান্তরে সমগ্রবঙ্গের হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হয়।

দেবীর এই অকালবোধন এবং শরৎকালে বাংলায় দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত,উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' তে বলা হয়েছে, ' ১৫৮০ খ্রিঃ মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিমায় দুর্গা পূজা করেন। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী কুল্লুকভট্টের পিতা রাজা উদয়নারায়ণকে উক্ত দুর্গোৎসব করিতে পরামর্শ দেন।ষোড়শ শতাব্দী হইতে অদ্যাবধি প্রতিমায় দুর্গাপূজা বঙ্গদেশে বাড়িয়া চলিতেছে ।' এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও উদ্বোধন প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডীতে' ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের কথা বলা হয়েছে, তাহেরপুরের মন্দিরলিপি এবং অন্যত্র ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দই উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়াও তাহেরপুরের প্রথম দুর্গাপূজার সপক্ষে অনেক তথ্যাবলি রয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের হিন্দু নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন, ঐতিহ্যমণ্ডিত তাহেরপুরের দুর্গামন্দিরকে বাংলাদেশের 'জাতীয় মন্দির' হিসেবে ঘোষণা করার আবেদন জানিয়েছে । এ ঘটনাও প্রমাণ করে, তাহেরপুরই সমগ্র অবিভক্ত বাংলার প্রথম দুর্গাপূজার মন্দিরস্থল।

সুলতানি আমলে বঙ্গে দুর্গাপূজা শুরু হওয়া প্রসঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক গবেষক বলেছেন যে, যোদ্ধার দেবী দুর্গা ও তাঁর আরও ভয়ংকর কালীরূপের আরাধনা বঙ্গে মুসলিম আক্রমণ এবং তাঁদের বঙ্গবিজয়ের সময় এবং তার পরে শুরু হয়েছে। এর কারণ হিন্দু রাজশক্তি ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী মুসলিম বিজয়ের সাথে সাথে বাংলার প্রান্তিক শক্তিতে পরিনত হয় নিজের স্বভুমিতেই। ফলে যুদ্ধের দেবী দুর্গা আরাধনাতেই তাঁরা নিজস্ব 'পরিচিতি' খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। তাঁরা তাঁদের ক্ষোভ, ক্রোধ এভাবেই দেবী দুর্গা ও কালীমূর্তির মধ্যে প্রকাশ করেছেন।

যাইহোক, তাহেরপুরের পরে আমরা পাই কুচবিহারের রাজপরিবারের দুর্গাপূজার কথা। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিশ্ব সিংহ তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'দুর্গাবাড়ি' বা 'দেবী বাড়ি' মন্দিরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেন। আবার কারো কারো মতে, দিনাজপুর ও মালদহের জমিদারগণ প্রথম দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। এর পরে যে উল্লেখযোগ্য দুর্গাপূজার কথা আমরা জানতে পারি সেটা হল বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পবিবারের দুর্গাপূজা। ওই পরিবারের লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের আটচালা বাড়ি দুর্গামন্দিরে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম তাঁদের পারিবারিক দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন। এই পুজা বাংলার অন্যতম প্রাচীন দুর্গাপূজা। এছাড়া আন্দুলের দত্তচৌধুরী জমিদার পরিবারের দুর্গাপূজাও খুব প্রাচীন পুজা। এই পরিবারের কাশীশ্বর দত্তচৌধুরী ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই পরিবারের প্রবীণ কেউ কেউ দাবি করেন, তাঁদের পরিবারের তেকড়ি বা তিনকড়ি দত্ত পঞ্চদশ শতকেই দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রভাবে এই পরিবারের কৃষ্ণানন্দ দত্ত বৈষ্ণব মতাবলম্বী হলে তাঁদের পুজায় বলিপ্রথা বন্ধ হয়ে যায়। তবে যিনিই দুর্গাপুজা প্রথম প্রচলন করে থাকুন, এই পুজা যে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগেই বাংলায় প্রবর্তিত হয়েছিল এ ব্যাপারে সন্দেহ নাই।

বঙ্গে দুর্গাপূজা শুরুর প্রথম দিকে হিন্দুসমাজের সম্ভ্রান্ত অংশেই এই পুজা সীমিত ছিল। প্রথমদিকে মধ্যযুগে, মুসলিম আক্রমণ এবং তাঁদের কাছে পরাজিত হবার অসহয়তাজনিত ক্রোধ ও বিদেশীদের থেকে স্বাধীন হবার আকুতি প্রকাশের চেষ্টা করতেন দুর্গাপূজা ও কালীপুজার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে মূলত প্রতিপত্তিশালী জমিদার শ্রেনীই এই পূজার অনুষ্ঠান করত। এই শ্রেণী প্রচুর জাঁকজমকপূর্ণ সমারোহের মাধ্যমে তাঁদের আভিজাত্য প্রকাশ করতে চাইত এই পূজার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে, এদেশে ইংরাজ রাজত্ব প্রসারের ফলে এক নতুন ব্যবসায়ী ও জমিদারশ্রেণীর আবির্ভাব হয়। ইংরাজ রাজত্বের শুরু থেকেই এই নতুন শ্রেণীর সাথে ব্যবসাবানিজ্য ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এঁরা কলকাতার 'বাবু' সমাজের মধ্যমণি হয়ে ওঠে। এঁরা দেশের নতুন রাজা ,ইংরাজদের তাঁদের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি প্রদর্শন করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এই অংশের মধ্যমণি ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। লর্ড ক্লাইভের আনুকুল্যে ও বদান্যতায় তাঁরা অতি জাঁকজমকের সাথে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেন। তাঁদের

ওই পুজায় নানা অহিন্দুসুলভ বিষয়ও ঢুকে পড়ে ক্লাইভ ও অন্যান্য ইংরাজদের তুষ্ট করার চেষ্টায়; সেখানে বাইজী নাচের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ওই একই বৎসরে কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও দুর্গাপূজা শুরু করেন । তাঁর পুজোতেও ইংরাজদের আনাগোনা ছিল। এছাড়া জানবাজারের রানী রাসমণির বাড়ির দুর্গাপূজাও খুব খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু তাঁর বাড়িতে দেশীয় আচারেই পুজা অনুষ্ঠিত হত, সেখানে ইংরাজদের আনাগোনা ছিল না। শোভাবাজার,কৃষ্ণনগর এবং রানী রাসমণির জানবাজারের বাড়িতে আজও অবিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে দুর্গাপূজা। তবে এগুলির মধ্যে কোনটিই বাংলার প্রথম দুর্গাপূজা নয়। তাঁরাও সেটা দাবি করেননি। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর ইতিহাস, 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' বা শোভাবাজার রাজবাড়ীর ইতিহাসদ্বয়, ' শব্দকল্পদ্রুম' বা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ' কলকাতার ইতিহাস' ইত্যাদি কোন গ্রন্থেই কিন্তু তাঁদের পরিবারের পুজোকে বাংলার প্রথম দুর্গাপূজা বলে উল্লেখ করা হয়নি।

অন্যদিকে দুর্গাচন্দ্র সান্যাল সহ অন্যান্যদের লেখা 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে, এই বিষয়ে অনেক তথ্য উল্লিখিত আছে। এই দুটি পূজার প্রায় পনের বৎসর আগেই,মারাঠারাজ রঘুজী ভোঁসলের মন্ত্রী ও সেনাপতি ভাস্কররাম কোলহাটকর (পণ্ডিত) বাংলায় চৌথ আদায় করতে এসে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে দাঁইহাটে বঙ্গীয় প্রথা মতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই পূজাও ১৭৫৭ সালের প্রায় ১৫ বৎসর আগের ঘটনা। এছাড়াও প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী স্মার্তপণ্ডিত রঘুনন্দন তাঁর 'তিথিতত্ব' গ্রন্থে দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি বর্ণনা করেছেন। মিথিলার প্রসিদ্ধ স্মার্তপণ্ডিত বাচস্পতি (১৪২৫-১৪৮০) তাঁর ক্রিয়াচিন্তামণি এবং 'বাসন্তী-পুজাপ্রক্রন' পুস্তকদুটিতে দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমার পুজাপদ্ধতির বর্ণনা করেছেন। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিও তাঁর 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'গ্রন্থে ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে মৃন্ময়ী দেবীর পুজাপদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রীর মতে, বঙ্গে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হাজার বৎসরের বেশী প্রাচীন। একসময়ে বাংলার ধনী গৃহস্থের বাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপ থাকতই। নবদ্বীপে মুকুন্দ সঞ্জয় পুন্যবন্তের চণ্ডীমণ্ডপে চৈতন্যদেব টোল খুলেছিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু খড়দহে নিজের বাড়িতে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করতেন। এইসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, অনেককাল আগে থেকেই বাংলায় মূর্তিতে দুর্গাপূজা প্রচলিত ছিল।

যাইহোক, এই দুর্গাপূজা কিন্তু একসময় জমিদারদের ঠাকুরদালান বা অভিজাত বাবুশ্রেণীর নাটমন্দিরের বাইরে অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। কথিত আছে, গুপ্তিপাড়ার কিছু যুবককে এক গৃহস্থের পূজাতে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তৎকালীন হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার ওই যুবকদের মধ্যেকার বারোজন ব্রাহ্মণযুবক বন্ধুরা মিলে প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে এসে দুর্গাপূজা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।তাঁদের প্রতিবেশীরা এতে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু ওই বারোজন যুবক প্রতিবেশীদের সন্দেহকে গুরুত্ব না দিয়ে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেন। বারোজন ইয়ার বা বন্ধু মিলে করেছিল বলে ওই পুজা 'বার-ইয়ারী' বা 'বারোয়ারী' পুজা নামে খ্যাত হয়। সাম্প্রতিককালে 'বারোয়ারী' শব্দটির পরিবর্তে 'সার্বজনীন' কথাটি বেশী প্রচলিত হয়ে পড়েছে, যদিও আমরা কম বয়সে 'বারোয়ারী' কথাটিই বেশী শুনতাম। ইতিহাস ও নাট্য গবেষক এবং কাশিমবাজার রাজ পরিবারের সদস্য ডঃ সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর প্রকাশিত 'দুর্গাপূজাঃ এ র্যাশন্যাল অ্যাপ্রোচ' প্রবন্ধে জানিয়েছেন,তাঁর পূর্বপুরুষ, রাজা কৃষ্ণনাথের পিতা, রাজা হরিনাথ রায় তাঁদের কাশিমবাজার রাজবাড়িতে ১৮২৪ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ অবধি দুর্গাপূজা করেছেন এবং তিনিই কলকাতায় ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে 'বারোয়ারী' দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। ধীরে ধীরে 'বারোয়ারী' কথাটির স্থলে 'সার্বজনীন' কথাটি প্রচলিত হয় সেটা আগেই বলেছি।

সার্বজনীন কথাটি কলকাতায় প্রথম ব্যবহার করে সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা। বাগবাজারে তাঁদের ওই পুজা অনুষ্ঠিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। সর্বসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেই ওই পুজা অনুষ্ঠিত হয়। আঠারো শতকের জমিদারী আভিজাত্য আর নব্য ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীর দুর্গাপূজা বিংশ শতাব্দীতে এসে স্বাধীনতাকামী, জাতীয়তাবোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। দুর্গাপূজাকে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে। দুর্গাদেবীকে শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করতেন তাঁরা । বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ সালে লেখা তাঁর 'আনন্দমঠে' দুর্গাকে 'দেশজননী' হিসেবে চিত্রিত করলেন। তিনি দেখালেন 'মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন। মা দুর্গার বন্দনায় ধ্বনিত হল 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র। ১৯০৩ সালের ৩ অক্টোবর 'Bengalee' পত্রিকায় পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখা হল, 'দুর্গা মূর্তি আমাদের ভারতীয় জাতীয়তার প্রতীক, তিনি যা আছেন তা নয়, তিনি যা হইবেন তাহার প্রতীক।' সেখানে লেখা হল, 'Nothing Bideshi, Everything Swadeshi.'। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলিতে তিনি মূর্ত হয়ে উঠলেন ' দেশজননী' ভারতমাতা রূপে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় জেলেই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেন। তিনি তাঁর মাতৃসমা দেশবন্ধুজায়া বাসন্তী দেবীকে ২৫/০৯/১৯২৫ এর এক চিঠিতে লিখলেন, "আজ মহাষ্টমী। আজ বাংলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা এই বৎসর এইখানেই শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করিতেছি। মা বোধহয় আমাদের কথা ভোলেন নাই, তাই এখানে এসেও তাঁহার পূজা-অর্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে"।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে দুর্গা কন্যারূপী উমা; আবার তিনিই ভয়হারিণী, শক্তিরূপিণী-অসুর-দলনী-অভয়দাত্রী-দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা। তিনি আমাদের মধ্যে অসুরবিনাশী শক্তিরূপে বিরাজিতা। কাল থেকে কালান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে তিনি আছেন আমাদের অন্তরে।

১০০ দিন পূর্ণ করল তৃতীয় মোদী সরকার

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম ১০০ দিনেই বিভিন্ন প্রকল্পে ১৫ লক্ষ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। মাত্র ১০০ দিনেই ১১ লক্ষ মহিলা 'লাখপতি দিদি'। দেশজুড়ে এক কোটি মহিলার জন্য এখন বছরে এক লক্ষ টাকা। ২৫ হাজার প্রত্যন্ত গ্রাম সড়কপথে যুক্ত। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় কুড়ি হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে, এর ফলে সাড়ে নয় কোটি কৃষক উপকৃত।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ শিবিরের জয় নয়া ইতিহাস রচনা করেছে। ১৯৬২ সালের পরে দ্বিতীয় কোনও প্রধানমন্ত্রী টানা দুবার পূর্ণ মেয়াদের সরকার পরিচালনার পরে তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। ৬২ বছর পরে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর এই রেকর্ড স্পর্শ করতে পেরেছেন নরেন্দ্র মোদী। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে টানা তিনবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর জয় সিলমোহর দিয়েছে বিজেপির জন কল্যাণকারী নীতিতেই। ২০২৪ সালের ৪ জুন টানা তৃতীয় বারের জন্য জেতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর রূপে

শপথ নেন নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বাধীন তৃতীয় এনডিএ সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ হয়েছে চলতি সেপ্টেম্বর মাসে। এরই মধ্যে একাধিক পদক্ষেপ করতে দেখা গিয়েছে তৃতীয় মোদী সরকারকে। তথ্য ও পরিসংখ্যান বলছে, তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম ১০০ দিনেই বিভিন্ন প্রকল্পে ১৫ লক্ষ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

তৃতীয় মোদী সরকারের ১০০ দিন উপলক্ষে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বিশেষ পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে সরকারের আমলে কী কী প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, তা বিশদে লেখা রয়েছে। তৃতীয় মোদী সরকারের ১০০ দিন পূর্তির অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় দিল্লিতে। তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, মোদী সরকার তৃতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর থেকে মাত্র ১০০ দিনেই ১১ লক্ষ মহিলাকে 'লাখপতি দিদি যোজনা'-র আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশজুড়ে এক কোটি সংখ্যক মহিলা এখন বছরে এক লক্ষ টাকা পান। প্রসঙ্গত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলারা যাতে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারেন, সে জন্যই এই যোজনা শুরু করেছে মোদী সরকার। তৃতীয় মোদী সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকও করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে অমিত শাহ বলেন, "আজ দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনও। মোদীর জন্মদিনে দেশের নানা প্রতিষ্ঠান 'সেবা পাখওয়াড়া' পালন করবে। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে আগামী ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই উদ্যোগ"। প্রসঙ্গত অমিত শাহ ওই সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানান, নরেন্দ্র মোদীর আমলে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নানা পলিসির বাস্তবায়ন হয়েছে। অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিরাপত্তা জোরদার করে গত ১০ বছরে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়তে সক্ষম হয়েছে মোদী সরকার।

সাংবাদিক সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "চলতি মেয়াদেও বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার তিন লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে ২৫ হাজারটি প্রত্যন্ত গ্রামকে সড়কপথে যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ৫০ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এ ছাড়াও, মহারাষ্ট্রের বধাবনে তৈরি করা হয়েছে একটি গভীর জলের বন্দর। বধাবন বন্দরের জন্য ইতি মধ্যেই ৭৬ হাজার ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সব ঠিক থাকলে এটি বিশ্বের শীর্ষ ১০টি বন্দরের মধ্যে জায়গা করে নেবে। খারিফ শস্যের উপর ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (এমএসপি) বৃদ্ধি, পেঁয়াজ ও বাসমতি চালের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য (এমইপি) অপসারণ, অপরিশোধিত পাম, সয়াবিন এবং সূর্যমুখী তেল আমদানিতে শুল্ক বৃদ্ধি — ইত্যাদি নানা পদক্ষেপে বোঝা যায়, কৃষির দিকেও নজর রয়েছে সরকারের।"

অমিত শাহ আরও জানিয়েছেন, কৃষি খাতে আমূল পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে 'এগ্রিসিওর' নামে একটি তহবিলও তৈরি করেছে সরকার। এতে ক্ষুদ্র এবং গ্রামীণ উদ্যোগগুলিও উৎসাহ পাবে।

তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেন, "নরেন্দ্র মোদীজি একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে বিশ্বের ১৫টি বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। মোদীজির এই সম্মানে সমগ্র দেশ গর্বিত হয়েছে।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও জানান যে উন্নয়ন, নিরাপত্তা- এই সমস্ত ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার আগের সরকারগুলির অনেক এগিয়ে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, "মোদী জমানায় এদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখা গিয়েছে। বর্তমানে দশ বছরের পরে ১১তম বছরে পা রেখেছে মোদী সরকার। এটা অনেক গর্বের বিষয়।" অমিত শাহ আরও জানিয়েছেন, বিগত ১০ বছরে মোদী সরকার সবদিক থেকে নিরাপদ ভারত গড়তে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিপুল সাফল্য নিজের ভাষণে উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তিনি বলেন, "মোদি জমানায় শিক্ষার আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে।" কৃষি ক্ষেত্রেও মোদী সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা দেশে তৈরি হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় কুড়ি হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে, এর ফলে সাড়ে নয় কোটি কৃষক উপকৃত হয়েছেন।"

তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম ১০০ দিন পূর্তিতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও বিবৃতি সামনে এসেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সাংবাদিকদের বলেন যে, "প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবেই বলেছেন তৃতীয় মেয়াদের সরকার মানে তিনগুণ বেশি পরিশ্রম, তিনগুণ বেশি শক্তি। আমরা যদি তিনগুণ কঠোর পরিশ্রম ও শক্তি দিতে পারি আমরা তাহলে ফলাফলও তিন গুণ বেশি হবে এবং দেশ এগিয়ে যাবে। বিগত ১০০ দিনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কঠিন কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।" অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এক বিবৃতিতে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে টানা তিনবারের সরকার ১০০ দিনের মেয়াদ পূরণ করল। আমরা গত ১০ বছর ধরে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টা করেছি। এটি আমাদের ঐতিহাসিক তৃতীয় মেয়াদ যেখানে আমরা প্রথম ১০০ দিনে অনেক কিছু অর্জন করতে পেরেছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জোট শরিকদের সম্মান করেন।" পীযূষ গোয়েল আরও জানিয়েছেন যে ভারত খুব শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

অন্যদিকে বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোদী সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে বলেন, "তৃতীয় মেয়াদের প্রথম ১০০ দিনে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে দরিদ্রদের তিন কোটি ঘর নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ১৫টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন চালু হয়েছে এই সময়কালে।" তিনি আরও বলেন, "মাত্র ১০০ দিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক কাজ করতে সক্ষম হয়েছে তৃতীয় মোদী সরকার।"

ইউনূসের হিংসার বাংলাদেশে ঘৃণ্য হিন্দু নিধন

দিব্যেন্দু দালাল

একমাসেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুরা আজও আক্রমণের শিকার হয়েই চলেছে। বাংলাদেশ ক্রমশই একটা মৌলবাদী জঙ্গীদের দেশ হয়ে উঠছে। অথর্ব ইউনূস কি পারবে শান্তি ফেরাতে?

বাংলাদেশে ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও দেশ থেকে পলায়নের পর থেকেই সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর নেমে এসেছে চরম বিভীষিকা। এমনিতেই বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের ওপর দীর্ঘ দিন ধরেই নৃশংস অত্যাচারের খবর প্রতিনিয়ত আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি সম্পূর্ণ ভাবে লাগাম ছাড়া হয়ে গেছে। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে।

বাংলাদেশে হিংসার সূত্রপাত হয় কোটার বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশে '৭১ -এর মুক্তিযোদ্ধাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সরকারী চাকরিতে ৩০ শতাংশ সংরক্ষণের বিরোধী আন্দোলন ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক আকার নিতে থাকে। ৪ঠা অগাস্ট খুলনার মেহেরপুরে ইস্কন মন্দির ইসলামী মৌলবাদীরা আক্রমণ করে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ ভাঙে আর গোটা মন্দির আগুনে ভস্মীভূত করে। দুর্বৃত্তরা ৬,০০,০০০ বাংলাদেশী টাকাও লুঠ করে। এই কথা জানান ইস্কন মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রী যুধিষ্ঠির গোবিন্দ দাস। ৫ই অগাস্ট মৌলবীবাজার জেলার কালীমাতা মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করে। একইদিনে রংপুরে হিন্দু কাউন্সিলর হারাধন রায় ও কাজল রায়কে হত্যা করে উন্মত্ত ইসলামী জনতা। হিন্দু সাংবাদিক প্রদীপ কুমার ভৌমিক যিনি এই হিংসাত্মক আন্দোলনের খবর করছিলেন তাঁকে হত্যা করা হয়। খুলনায় পুলিশের কনস্টেবল সুমন ঘরামিকে হত্যা করা হয়।

৫ই অগাস্টের সেই ভয়ানক দিনে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে ২৭ টি জেলায় হিন্দুদের সম্পত্তি ধ্বংস করে উন্মত্ত জনতা। লালমণির হাট, পাঁচঘড়া, খুলনার বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের বাড়ি, ব্যবসা স্থলে চলে নির্বিচার লুঠতরাজ ও ধ্বংসলীলা। ২০০ –এর বেশী হিন্দুদের বাড়িঘর আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশের বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী রাহুল আনন্দও বাদ যাননি। ওনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও প্রায় দশ লক্ষ টাকার মূল্যবান বাদ্যযন্ত্র লুঠ করার পর বাসস্থানে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

এই অমানুষিক আক্রমণের শিকার অসহায় হিন্দুরা ভারতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে। ৬ই অগাস্টের একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায় পাঁচঘড়া জেলার বহুবন সীমান্তে হিন্দু পরিবারগুলো নিজেদের সুরক্ষিত করতে ওপারে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে! শেখ হাসিনার অপসারণের তিনদিন পর ৮ই অগাস্ট নোবেল শান্তি পুরষ্কার প্রাপ্ত মহম্মদ ইউনূসকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। মহম্মদ ইউনূসের শান্তি রক্ষার আবেদন করা সত্ত্বেও হিন্দুদের ওপর হিংস্র আক্রমণ অব্যাহত থাকে। 'ডেইলি স্টার' সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী ৯ই অগাস্ট 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ' -এর রিপোর্টে বাংলাদেশের ৫২ টি জেলায় সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর ২০৫টি আক্রমণের কথা বলা হয়েছে।

সংঘটিত গণহত্যার এই ভয়ঙ্কর আবহে বহু হিন্দু নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন অথচ দুঃখের বিষয় হল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বা মহিলা অধিকার সংগঠনগুলি

রংপুরে সনাতনীদের মিছিল।

আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে পারেনি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল যারা প্যালেস্টাইনের ওপর ইজরায়েলের আক্রমণকে নিয়ে নিন্দার ঝড় বইয়ে দেন, রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সোচ্চার হন তাঁরা সম্ভবত এখন মৌনব্রত পালন করছেন! নিউইয়র্ক টাইমস ৭ই অগাস্ট একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যার শিরোনাম ছিল "Hindus in Bangladesh Face Revenge Attacks After Prime Minister's Exit"। পরবর্তীকালে পাঠকদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার পর তারা শিরোনাম থেকে 'revenge' শব্দটি সরায়। একই ধরণের ন্যারেটিভ ধরা পড়ে Human Rights Watch নামক প্রতিষ্ঠানের লেখায়। তাদের এশিয়া মহাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর মীণাক্ষী গাঙ্গুলি লেখেন, "Hindus are being attacked because they traditionally supported her Awami League party. Bangladeshis came out on the streets to demand an end to authoritarianism, and these attacks undermine their just demand for human rights." অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সমর্থক হওয়ার জন্যই হিন্দুদের এই পরিণতি! ভারতের বাম ঘেঁসা মিডিয়া Scroll তাদের একটি প্রতিবেদন যার শিরোনাম ছিল "Bangladesh: Why there must be caution in understanding the violence against Hindus", তাতে তারা এই আক্রমণকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে গিয়ে লেখে, "In India, the Hindutva propaganda machinery within the sections of Indian media, along with various kinds of rumours and misinformation, has exacerbated this apprehension"। অর্থাৎ ভারতের হিন্দুত্ববাদী প্রচারযন্ত্র এই সব ঘটনা নিয়ে গুজব ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে!

তবে ন্যারেটিভ যেটাই হোক সত্য ধামাচাপা থাকে না বেশীদিন। বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ঘটে যাওয়া বর্বরতার ছবি অনতিবিলম্বে ছড়িয়ে পড়ে দেশের বাইরে। গোটা পৃথিবীর মানুষ বিস্ময় আর আতঙ্কের সঙ্গে দেখে কিভাবে একটা হিন্দু পরিবারে বাবা,মা ও সন্তানকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, হামলায় মৃত হিন্দু পুরুষের লিঙ্গ দেখে তার ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়ে উন্মত্ত সন্ত্রাসী জনতা, কিভাবে পিতৃসম, মাতৃসম শিক্ষককে চরম হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দিচ্ছে তাঁদের সন্তানতুল্য ছাত্র-ছাত্রীরা আর বাধ্য করা হচ্ছে পদত্যাগ করতে, কিভাবে ধর্ষিত, নগ্ন দেহের ওপর বারংবার আঘাত করে তাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করছে সাম্প্রদায়িক বর্বর জনতা! হিন্দুরা রাতের পর রাত জেগে পাহারা দিয়েছেন তাদের এলাকা, মহিলারাও বাদ যাননি। ঢাকার রাস্তায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মিছিল করে প্রতিবাদ জানিয়েছে হিন্দুরা।

একমাসেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, হিন্দুরা আজও আক্রমণের শিকার হয়েই চলেছে একইভাবে। গত ৫ই সেপ্টেম্বর আঠারো বছর বয়সী হিন্দু কিশোর উৎসব মণ্ডলের ফেসবুকে লেখা একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে মৌলবাদীরা উৎসবকে পুলিশ স্টেশনের মধ্যেই গণপিটুনি করে। প্রথমে তাকে মসজিদ থেকে মৃত বলে ঘোষণা করা হলেও পরে জানানো হয় যে সে জীবিত আছে। এর মধ্যেই স্বয়ং বাংলাদেশী মন্ত্রী ফরমান জারি করে বলেন যে দুর্গাপূজায় আজান ও নামাজের সময় মাইক বন্ধ রাখতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলাদেশ ক্রমশই একটা মৌলবাদী জঙ্গীদের দেশ হয়ে উঠছে এবং অদূর ভবিষ্যতে গোটা দেশ হিন্দুশূন্য হয়ে পড়বে। দেশভাগের সময় ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব মেনে যদি সব হিন্দুদের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে নিয়ে আসা হত তা হলে আজ এই ভয়ঙ্কর দিন হয়তো দেখতে হত না।

প্যারা অলিম্পিকে সোনার হাসি এনে দিল মোদীর নতুন ভারত

অভিরূপ ঘোষ

জাগতে আরম্ভ করেছে ঘুমন্ত দেশ। এ বছর প্যারিস প্যারা অলিম্পিকে পদক তালিকার প্রথম কুড়িতে থাকার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। তা পূর্ণ হয়েছে। ৪ বছর পর ২০২৮ সালে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে হবে পরবর্তী প্যারা অলিম্পিক। সরকারের সহযোগিতা এবং নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই অলিম্পিকে নিশ্চিতভাবে আরও ভালো ফল করবে টিম ভারত। টার্গেট প্রথম ১০।

"আপনার জন্যে একটা টুপি এনেছি স্যার। আপনি পড়লে ভালো লাগবে।"

নভদীপ সিং। এফ৪১ প্যারা বিভাগের (বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতার উপর নির্ভর করে বেশ কিছু বিভাগে ভাগ করা হয় প্যারা অ্যাথলিটদের। এফ৪১ সেরকমই একটা বিভাগ) জ্যাভলিন থ্রোয়ার ছিলেন হরিয়ানার রোহতকের নভদীপ। তাঁর থেকে পদক বড় একটা কেউ প্রত্যাশা করেনি। ওই একই ইভেন্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হোল্ডার থেকে টোকিও অলিম্পিকের মেডেল হোল্ডার অব্দি অনেকেই অংশগ্রহণ করেছিলেন নভদীপের বিপক্ষে। নভদীপ যদিও প্রতিপক্ষদের দেখে ভয় পাননি। নিজের সমস্ত শক্তিটুকু নিংড়ে দিয়ে ছুঁড়েছিলেন নিজের বল্লমটা। সে জ্যাভলিন গিয়ে পড়েছিল ৪৭.৩২ মিটার দূরে। অসাধারণ অনবদ্য থ্রো, দেশকে আরও একটা সোনা পাইয়ে দেওয়া থ্রো।

"প্যারা অলিম্পিক ইভেন্টের আগে বড্ড টেনশনে ছিলাম। চাপে নুইয়ে পড়েছিলাম। তারপর অগাস্টের কুড়ি তারিখে আপনার সঙ্গে দেখা করার পর টেনশন একেবারে কমে যায়। সোনা জেতার খিদেটা খুব বেড়ে গেছিল কারণ সোনা জিতলে আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে অনেকটা সময় কাটানোর সুযোগ পেতাম। আমার কোচ,ফিজিও এবং সবার তরফ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের পাশে থাকার জন্য।" নভদীপ সিংয়ের মত ওই জ্যাভলিন ছোঁড়ার এফ৬৪ বিভাগের সোনাটাও এবারে এসেছে ভারতের হাতে। পেয়েছেন সুমিত আন্টিল। সুমিত টোকিও প্যারা অলিম্পিকেও এই বিভাগে সোনা পেয়েছিলেন। সুমিতের বাবা ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার কর্মী। ছোটবেলার সুমিত চেয়েছিলেন দেশের সেবা করতে,চেয়েছিলেন দেশের জন্য কিছু করতে। কিন্তু মাত্র ১৭ বছর বয়সে এক বাইক দুর্ঘটনায় তার একটা পা কাটা পড়ে যায়। তবে সেনা কর্মীর ছেলে হার মানে নি। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই ঘটনার মাত্র ছয় বছর পর দেশের জন্য নিয়ে এসেছিলেন প্যারা অলিম্পিক সোনা। তিন বছর পর পরের প্যারা অলিম্পিকে আবার সোনা একই ইভেন্টে। সুমিত আজ ভারতের এমন একজন অ্যাথলিট যিনি পরপর দু'বার অলিম্পিকে সোনা জিতলেন।

পর পর দুবার (টোকিও আর প্যারিস) অলিম্পিক সোনা জিতেছেন আরো একজন। অবনী লেখারা, শুটিংয়ে। অবনী আর সুমিত ভারতের গর্বা তাই দু'জনকেই ২০২১ সালে খেলরত্ন পুরস্কার আর ২০২২ সালে পদ্মশ্রী দিয়ে সম্মানিত করেছে ভারত সরকার।

উপরিউক্ত তিনজন ছাড়াও এবারে দেশের জন্য সোনা জিতে এনেছেন হরবিন্দর সিং (তীরন্দাজি), নিতেশ কুমার(ব্যাডমিন্টন), ধরমবির নই (ক্লাব থ্রো) এবং প্রবীণ কুমার (হাইজাম্প)। এনারা প্রত্যেকেই নিজেদের শারীরিক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে সর্বোচ্চ পরিশ্রম এবং অনুশীলনের মাধ্যমে গর্বিত করেছেন দেশকে।

সোনা জিততে না পারলেও দেশকে সমানভাবে গর্বিত করেছেন সেই ২২ জন ক্রীড়াবিদ যারা রূপো বা ব্রোঞ্জ জিতেছেন এবারের প্যারা অলিম্পিকে। ১৭ বছরের বাহুহীন তীরন্দাজ শীতল দেবী বা ডবল ব্রোঞ্জ জেতা প্রীতি পাল বা প্রয়াগরাজের জেলাশাসক সুহাস জ্যোতিরাজ শুধু যে সবাইকে অবাক করেছেন তাই নয়, নতুন প্রজন্মের সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন নিজেদের অসাধারণ পারফরমেন্স দিয়ে। যদিও ভারতীয়দের পারফরমেন্সের এই অসাধারণ উন্নতি রাতারাতি হয়নি। প্রতিভার অভাব ভারতীয় উপমহাদেশে কোনদিনই ছিল না। অভাব ছিল গুরুত্বের আর পাশে থাকার। বর্তমান সরকার সেটুকু দিয়েই পাশে থেকেছে খেলোয়াড়দের।

কুমার বিশ্বাস আম আদমি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন। কিছুদিন আগে তিনিও একটি ইন্টারভিউতে বলতে বাধ্য হলেন যে কোন প্রধানমন্ত্রী যখন ইভেন্টের আগে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে পিঠ চাপড়ে দেন আর ইভেন্টের পরে জয়ী-বিজয়ী নির্বিশেষে প্রত্যেককে উৎসাহ দান করেন, পরবর্তী খেলার জন্য তখন দেশের সার্বিক ফলাফল ভালো হতে বাধ্য।

ঘটনাচক্রে নরেন্দ্র মোদির আগে দেশের কোন প্রধানমন্ত্রী এভাবে খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়ান নি। আরো বড় কথা এই যে সাধারণ অলিম্পিক আর প্যারা অলিম্পিককে একেবারে এক নজরে দেখেছেন তিনি। বিশেষভাবে সক্ষম বলে কাউকে ছোট তো করেনই নি, উল্টে উৎসাহ দিয়েছেন ভালো কিছু করার। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই 'বিশেষভাবে সক্ষম' বা 'দিব্যাঙ্গ' শব্দবন্ধ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ব্যবহার শুরু হয়েছে। আগে কংগ্রেসের সময় তাদেরকে অপমানজনকভাবে 'বিকলাঙ্গ' বলা হতো। আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন ২০০৫ সালের তৈরি বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আইনে মাত্র সাত রকম প্রতিবন্ধকতা কথা উল্লেখ ছিল বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৬ সালে সেই আইনের সংশোধন করে ২১ রকম প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করেছেন যাতে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষজন আরো অনেকে আইনি,সামাজিক ও সরকারি সুবিধা পেতে পারে। এছাড়া ট্রেন-বাস থেকে আরম্ভ করে ভোটদান কক্ষ পর্যন্ত সর্বত্র বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্র। অর্থাৎ সার্বিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে বিজেপি সরকারের আমলে। তাই সমাজের সর্বস্তরে এখন দিব্যাঙ্গজনদের এগিয়ে আসার সংখ্যা বাড়ছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ক্রীড়াক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবেই তার ব্যতিক্রম নয়। পূর্ববর্তী সরকারের সঙ্গে বর্তমান সরকারের সময়ে মেডেল সংখ্যার ফারাক সে কথা স্পষ্টভাবে জানান দেয়।

প্রথমে একটু ফারাকটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আর যেহেতু সংখ্যাতত্ত্বের চেয়ে বেশি নির্ভেজাল প্রামাণ্য নথি আর কিছু হয় না তাই প্রথমে সংখ্যার হিসাবটুকু বুঝে নেওয়া যাক। সাল ২০০৮। শেষ তিন দশকে ভারতের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অলিম্পিক এবং প্যারা অলিম্পিক ইভেন্ট ছিল সে বছর। কারণ দু'বছর পর ২০১০ সালে কমনওয়েলথ গেমসের আসর অনুষ্ঠিত আসর বসার কথা দিল্লিতে। এই অবস্থায় নিজেদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্পোর্টস নেশন হিসেবে তুলে ধরতে না পারলে কমনওয়েলথ গেমসে খুব একটা বেশি গুরুত্ব মিলতো না এটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। আর ঠিক এখানেই বরাবরের মতো নিজেদের ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছিল কংগ্রেস। যেখানে ২০০৪ সালে বারোজন

ভারতীয় প্রতিযোগী প্যারোঅলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছিল সেখানে পরের এডিশনে (২০০৮) প্রতিযোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়ালো পাঁচে। মেডেল সংখ্যা শূন্য। না ২০০৮ সালের প্যারাঅলিম্পিককে ব্যতিক্রমী হিসেবে ভাবার কোন ব্যাপার নেই। কারণ তার পরের বার, অর্থাৎ ২০১২ সালে, অংশগ্রহণকারী ভারতীয় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র দশ। মেডেল সংখ্যা এক (রুপো)।

এরপর ২০১৪ সালে সরকারের পরিবর্তন হয়। ক্ষমতায় আসে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। ভারতে ক্ষমতা পরিবর্তনের পরের প্যারা অলিম্পিক বসেছিল ২০১৬ সালে। সেই বছর এবং তার পরের এডিশনগুলোয় ভারতের সার্বিক ফলাফল বিশ্লেষনের আগে দেখে নেওয়া দরকার ২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত প্যারা অলিম্পিকে ভারতের সামগ্রিক পারফরম্যান্স কেমন ছিল।

প্যারা অলিম্পিক শুরু হয় ১৯৬৮ সালে। দশ জন প্রতিযোগী নিয়ে ভারত সে বছরই অংশগ্রহণ করে ইজরায়েলের তেল আভিভ প্যারা অলিম্পিকে। মেডেল সংখ্যা শূন্য। ১৯৬৮ সালের পর থেকে প্রতি চার বছর অন্তর প্যারা অলিম্পিক হয়ে আসছে। ১৯৬৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ভারত প্যারা অলিম্পিক থেকে মোট দুটি সোনার পদক জিততে সক্ষম হয়। রুপো আর ব্রোঞ্জ যোগ করলে মোট পদকের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র আট। এরমধ্যে মাত্র চারবার বাদ দিলে বাকি প্রতিবারই ভারতকে খালি হাতে (অর্থাৎ কোন মেডেল না নিয়ে) দেশে ফিরতে হয়েছে। হ্যাঁ, এর মধ্যে অটল বিহারী বাজপেয়ী শাসনাধীন একটা টার্মও ছিল সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। যদিও তথ্য বলছে ১৯৬৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ২০০৪ সালেই সর্বাধিক বারো জন প্রতিযোগী প্যারা অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে। আর ওই সময়কালের মধ্যে সবথেকে ভালো পারফরম্যান্স করে (একটি সোনা আর একটি ব্রোঞ্জ) ২০০৪ সালে দেশে ফেরে ভারতীয় প্রতিযোগীরা। যেহেতু ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়ন সময় সাপেক্ষ এবং তা রাতারাতি সম্ভব নয়, তাই দীর্ঘদিনের কংগ্রেস শাসনের পর হঠাৎ ভালো ফল হয়ে যাবে এটা প্রত্যাশা করা ভুল। তার মধ্যেই ২০০৪ সালের ফল প্রমাণ করে অটল বিহারী বাজপেয়ি সরকার অন্ততপক্ষে চেষ্টাটা করেছিল।

এদিকে ২০১৪ সালে দশ বছরের কংগ্রেসী অপশাসনের পর ক্ষমতায় এসেই নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করে। মাত্র দু'বছরে খুব বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তারপরেও প্রতিযোগী এবং জেতা মেডেলের সংখ্যার বিচারে ২০১৬ রিও ডি জেনিরো প্যারা অলিম্পিক আগের সবগুলোকে ছাপিয়ে যায়। ততদিন পর্যন্ত সর্বাধিক ১৯ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে দুটি সোনার মেডেল সমেত চারটি মেডেল

জেতে ভারত।

যদিও সাফল্যের ক্ষেত্রে ২০১৬ সালে রিও প্যারা অলিম্পিক হিমশৈলের চূড়া ছিল মাত্র। কারণ তার পরের দুটি এডিশনে অসাধারণ ফলাফল করে ভারতের বিশেষভাবে সক্ষম ক্রীড়াবিদেরা বুঝিয়ে দেয় সরকার পাশে থাকলে তারা নিজেদের সেরাটা দিয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য আনার ক্ষমতা রাখে। ২০২০ টোকিও প্যারা অলিম্পিক তার বড় প্রমাণ।

টোকিও প্যারা অলিম্পিকে ৫৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন ভারতের হয়ে। ঘটনাচক্রে স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সব মিলিয়ে চারটি গোল্ড মেডেল সমেত মোট বারোটি পদক জিততে পেরেছিল ভারত। আর শুধু টোকিও প্যারা অলিম্পিকেই পাঁচটি সোনার পদক সমেত মোট উনিশটি পদক দেশে নিয়ে আসেন ভারতের প্যারা অ্যাথলিটরা। দেশের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষেরা ভেবেছিলেন টোকিওতেই ভারতের প্যারা অ্যাথলিটরা সর্বকালের সেরা পারফরমেন্স করে এসেছেন। কিন্তু ২০২৪ সালের প্যারিস প্যারা অলিম্পিক তাঁদের সবাইকে ভুল প্রমাণিত করেছে। মোট ৮৪ জন প্যারা অ্যাথলিট নিয়ে প্যারিসে গিয়েছিল ভারত। ফিরল সাত সাতটি সোনা সমেত মোট উনত্রিশটি মেডেল নিয়ে। টিম ভারত অবাক করে দিল গোটা বিশ্বকে।

তবে এই সবে শুরু। জাগতে আরম্ভ করেছে ঘুমন্ত দেশ। চার বছর পর ২০২৮ সালে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে হবে পরবর্তী প্যারা অলিম্পিক। সরকারের সহযোগিতা এবং নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই অলিম্পিকে নিশ্চিত ভাবে আরও ভালো ফল করবে ভারত। এ বছর পদক তালিকার প্রথম কুড়িতে থাকার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। তা পূর্ণ হয়েছে। পরেরবার প্রথম দশে থাকার জন্য লড়বে টিম ভারত। আশা করা যায় উন্নতির ধারা বজায় রেখে দুর্দান্ত একটা ফলাফলের জন্য তৈরি থাকবে ভারতের প্যারা অ্যাথলিটরা।

ফেক নিউজ

ঘুষঘুষে পুলিশ ০১

১৪ অগাস্ট রাতে আরজি কর মেডিকেল কলেজে তৃণমূলী গুন্ডাদের হামলা আটকাতে ব্যর্থ হওয়ার পর ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয় কলকাতা পুলিশ। সেইসময় আমজনতার পোস্ট করা একটি ছবিতে দেখা যায় কলকাতা পুলিশের এক কনস্টেবল রাস্তায় চলন্ত একটি বাস থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে টাকা নিচ্ছে। খুব দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় সে ছবি। ইমেজ শোধরাতে ময়দানে নামে কলকাতা পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের অফিসিয়াল পেজ থেকে একটি সরকারি চালান পোস্ট করে তারা জানায় যে উক্ত ছবি নাকি ঘুষ খাওয়ার নয়। বরং ওই কনস্টেবল ২০২৪ সালের ২৫শে আগস্ট সরকারি নিয়মমতো ৫০০ টাকা স্পট ফাইন করছিলেন বাস ড্রাইভারকে।

আসল খবরঃ

পোস্ট করার কয়েক মিনিটের মধ্যে জানা যায় কলকাতা পুলিশের ওই চালান এবং খবর দুটোই মিথ্যে। কারণ এক বছর আগে ২০২৩ সালে কলকাতা পুলিশের ওই কুকীর্তির ছবি (যা কিনা পুলিশ ২০২৪ সালের ২৫ অগাস্টের বলে দাবি করেছিল) তারিখসহ বহাল তবিয়তে রয়েছে ফেসবুকের বিভিন্ন পেজে!

পুলিশের ফেক নিউজ? ২

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ নিজেদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের কভার ফটো পাল্টে নতুন ছবি দেয়। নতুন ছবিতে দেখা যায় কিছু মানুষ ঢিল ছুঁড়ছে এক পুলিশ অফিসারের দিকে এবং তিনি কোনরকমে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন।

আসল খবরঃ

পুলিশ অফিসারের ড্রেস অনেকটাই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মতই। যদিও পোস্ট করার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জানা যায় ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের নয়, কাশ্মীর উপত্যকার।

ডাক্তারদের চাপে ফেলতে ঘাসফুলের মিথ্যা তথ্য! ৩

সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৬ সেপ্টেম্বর রাতের বেলা এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে দাবি করেন দুর্ঘটনার শিকার কোন্নগরের একটি ছেলে নাকি তিন ঘন্টা ধরে টানা রক্তপাত সহ্য করে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছে কোনো চিকিৎসা ছাড়াই। ঘটনাস্থল আরজি কর মেডিকেল কলেজ। যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের লম্বা পোস্টে কোথাও লেখেননি যে হুগলির মহকুমা হাসপাতাল বা সুপার স্পেশালিটিতে চিকিৎসার ন্যূনতম সুবিধা না থাকায় সুদূর কোন্নগর থেকে ছেলেটিকে নিয়ে যেতে হয়েছিল কলকাতার আরজি কর-এ।

আসল খবরঃ

ডাক্তারদের জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম রীতিমতো বিবৃতি জারি করে প্রমাণসহ জানায় ছেলেটিকে সকাল ন'টা বেজে দশ মিনিটে আরজি করে ভর্তি করার সাথে সাথেই তার চিকিৎসা শুরু হয়েছিল এবং দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর আগে পর্যন্ত চিকিৎসকরা চেষ্টা করেছিলেন ছেলেটিকে বাঁচাতে। অর্থাৎ তিন ঘন্টা ধরে বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকার পোস্ট সম্পূর্ণরূপে ভুয়ো।

বাম- কংগ্রেসের ঢপ ৫

কংগ্রেস আমলে কেনা মিগ বিমানগুলিকে 'উড়ন্ত কফিন' বলে ডাকেন অনেকে। খুব ঘনঘন দুর্ঘটনার শিকার হত এই ফাইটার বিমানগুলো। তুলনায় সুখোই ফাইটার জেট অনেক বেশি নিরাপদ। ভারতের বিমান বাহিনীর অন্যতম স্তম্ভ এই সুখোই ৩০ যুদ্ধবিমান।

বিদেশি বোদ্ধা এবং মিডিয়া, একটি ধ্বংস হওয়া সুখোই ফাইটার জেটের ছবি পোস্ট করে দাবি করতে থাকে ওই যুদ্ধবিমান ভারতের। ঘটনাচক্রে সেই ট্যুইট ভারতের সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেয় বামপন্থী এবং কংগ্রেসের আইটি সেল। যদিও ভারতীয় যুদ্ধবিমানকে বদনাম করার চেষ্টা তো সফল হয়নি।

আসল খবরঃ

ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন একটা ভিডিও গেমে সুখোই ৩০ ব্যবহার করে অনলাইনে খেলতে পারা যায়। সেভাবেই খেলতে খেলতে গেমের একটা যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়ে যায়। এর সাথে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই।

দেশবিরোধী কংগ্রেস ৬

আমেরিকান কংগ্রেসের মহিলা সদস্য ইহান ওমর বেশ কিছুদিন আগে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে যান এবং ভারত বিরোধী নানা কথাবার্তা বলে আসেন। আমেরিকার সরকার তথা ভারতে বসে থাকা রাষ্ট্রবিরোধী লোকজন বলেন এই সফর ব্যক্তিগত এবং এর সঙ্গে সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি যদিও দাবি করেছিল গোটা সফরটাই সম্পন্ন হয়েছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার মদতে। আশ্চর্যজনকভাবে রাষ্ট্রের সুরক্ষা জড়িত থাকা সত্ত্বেও সরকারের এই

নীতির সমালোচনা করতে শুরু করে কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য ছিল ভারতের নয়, আমেরিকার দাবিই সত্যি।

আসল খবরঃ

যদিও ভারতীয় জনতা পার্টির মুখপাত্ররা প্রমাণ দাখিল করে নিশ্চিত করেন ওই মহিলা আমেরিকান কংগ্রেস সদস্যের পুরো সফর সম্পন্ন হয়েছে পাকিস্তানের খরচে।

তিরুপতিতে বিতর্কিত 'কংগ্রেসি' লাড্ডু ৭

তিরুপতি মন্দিরের লাড্ডু সংক্রান্ত বিষয় অনেকেরই জানা। ঘটনাচক্রে সনাতনীকে ছোট করে ওই ঘটনার পুরোটাই ঘটেছিল

কংগ্রেস এবং তাদের জোট সঙ্গীর আমলে। দুর্ভাগ্যের বিষয় কংগ্রেস সনাতনীদের অপমান করতে সেই লাড্ডু পাঠিয়েছিল অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধনেও। এখন যখন সত্যিটা ধীরে ধীরে সামনে আসতে শুরু করেছে তখন নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফেক খবর ছড়াতে আরম্ভ করেছে। তাদের সাম্প্রতিকতম দাবি অনুযায়ী ওই অশুদ্ধ ঘি নাকি আমূল কোম্পানির মাধ্যমে তিরুপতি মন্দিরে পাঠিয়েছিল গুজরাট সরকার।

আসল খবরঃ

যদিও বাস্তব সত্যি হলো ওখানে দীর্ঘদিন যাবত আমূল কোম্পানির কোন প্রোডাক্ট ব্যবহারই করা হয় না। তাই একটা নির্লজ্জ অপরাধ করার পরেও এরকম মিথ্যা বচন পাপ। যদিও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আমূল কোম্পানি কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সমেত সনাতন বিরোধী আরো অনেকের বিরুদ্ধে আদালতে গেছে মিথ্যে খবর ছড়ানোর অভিযোগ নিয়ে।

চতুর্দেশীয় অক্ষের (কোয়াড) বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিয়ো কিশিদা এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিস। কোয়াড সম্মেলনের ভাষণে নরেন্দ্র মোদী বলেন, আমাদের সকলের অগ্রাধিকার ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্বাধীন, মুক্ত, সমৃদ্ধিমূলক বাতাবরণ বজায় রাখা। সেটাই আমাদের অঙ্গীকার।''

মোদীময় নিউইয়র্ক।

নিউইয়র্কে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

বাংলাকে পুজোর উপহার দিলো মোদী সরকার

বিজেপি

বাংলায় পৌরসভা এলাকায় গরিব
মানুষের বাড়ি তৈরির জন্য

১৯০ কোটি

দিলো **মোদী সরকার**

শিল্প হোক বা আবাসের বাড়ি
মোদীতেই ভরসা রেখেছে পশ্চিমবঙ্গবাসী

/BJP4Bengal bjpbengal.org

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।